বাংলা

বিজ্ঞান কথা

Vol. II | Issue 2

ফেব্রুয়ারী ২০২৪

রামন এফেক্ট আবিষ্কারের দিনগুলি

1928 সালের ফেব্রুয়ারির 28 তারিখে অধ্যাপক রামন কিছুটা দীর্ঘ একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন লন্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'নেচার' এ। তার একটি গবেষণার ফল এর মধ্যে দিয়ে দ্রুত বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য ছিল তার এই প্রয়াস।

- ভারতীয় পরীক্ষাগারের জনক
- অথ মিসিসিপি কথা
- রূপে তোমায় ভোলাব না
- যারা আলো জ্বেলেছিল
- প্রসঙ্গ জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস

Shanti Foundation

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

রামন এফেক্ট আবিষ্কারের দিনগুলি ৬
ভূপতি চক্রবর্তী

ভারতীয় গবেষণাগারের জনক ১০
অমিতেশ ব্যানার্জী

অথ মিসিসিপি কথা ১২
অচিন্ত্য পাল

রূপে তোমায় ভোলাব না ১৭
দীপাঞ্জন ঘোষ

যারা আলো জ্বেলেছিল ২০
অরুণাভ দত্ত

সবুজ বাঁশপাতি ২৪
তাপস কুমার দত্ত

প্রসঙ্গ জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস ২৬
অমর কুমার নায়ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ফেব্রুয়ারি মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৮

ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ৩০

গ্রন্থ সমালোচনা ৩২

সম্পাদক সমীপেষু

প্রিয় সম্পাদক,

ই-পত্রিকার ভাবনা বিগত করোনা কালে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় থাকা এই পত্রিকার ছাপা বিষয়ের ঝঞ্ঝাট নেই। মোবাইল, ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে তা সহজেই পড়া যায়। প্রয়োজন মত ডাউনলোড করা যায়। এখানেও সাবস্ক্রিপশন বিষয়টি রয়েছে কোনো কোনো পত্রিকায়। অবশ্য বেশিরভাগই কোনো খরচ ব্যতিরেকে পাঠে মনোযোগী হওয়ার সুবিধাদানে দায়বদ্ধ।

1875 সালে বঙ্গদর্শনের পাতায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের কথা শুনাইতেই হইবে। এইভাবে শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাত্ পরিবর্তিত হয়।" এরপর অনেক ঘটনা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ভাবনার তরীটিকে এগিয়ে নিয়ে চললেও এখনো সে দূর দিগন্তে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়নি। প্রতিবেশী বাংলাদেশ বরং কিঞ্চিত এগিয়ে এই প্রতিযোগিতায়। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় তথ্য বিপ্লব ঘটে গেছে বিগত 30–40 বছরে। ভারতবর্ষ আজ প্রায় 150 কোটি মানুষের জনবহুল দেশ। এখনো নিরক্ষরতার অভিশাপ কম নয়। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মধ্যেও পাঠের আগ্রহ নেই বললেই চলে। নতুনকে জানা, কৌতুহলপ্রবণ মন গড়ে তোলা—এইসব কাজ মুখ্যতঃ স্কুলের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে গড়ে তোলা উচিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে আমরা অনেক পিছিয়ে।

এজন্য বিজ্ঞানের ই-পত্রিকা অবশ্যই স্বাগত। স্কুল-কলেজের শিক্ষক সমাজ এইসব পাঠে নিজেরা যেমন সমৃদ্ধ হবেন তেমনি ছাত্র-ছাত্রী সমাজকেও পাঠে উদ্বুদ্ধ করবেন। 'বিজ্ঞান কথা' পত্রিকাটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমি অনেকগুলি সংখ্যা ডাউনলোড করে আমার ফাইলে সংরক্ষিত করেছি। আমি গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ–বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের একজন সাহায্যকারী। আমাদের এখানে প্রিন্ট মিডিয়া নির্ভর 435টি বিজ্ঞান পত্রিকার সংরক্ষিত আছে সেই সঙ্গে আরও 5/6টি ই-পত্রিকাও আমরা নিয়মিত সংরক্ষিত করি।

'বিজ্ঞান কথা' পত্রিকাটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত। প্রতিটি লেখাই বেশ আকর্ষণীয়। পড়ে সহজেই বোঝা যায়। ছবিও ভালো। আমি এই পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

তরুণ রায়

সদস্য, গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ

7002123314

সম্পাদকীয়

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস—ভারতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য উদযাপন

ফেব্রুয়ারী মাসের সাথে সাথে এসে পরে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার লগ্ন। সারা দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যস্ততম সময়। ছাত্রসমাজের জন্য বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য এটি উৎসর্গ, অধ্যবসায় এবং মূল্যায়নের সময়। এর মধ্যে দিয়েই তরুণ মন পরীক্ষার বাধা উত্তীর্ণ করে দেশের বৈজ্ঞানিক কর্মশক্তির ভবিষ্যতের স্থপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস একটি প্রাণবন্ত উদযাপন যা দেশের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব এবং অগ্রগতির কাহিনীকে তুলে ধরে। 1928 সালে স্যার সি.ভি. রামনের রামন প্রভাব আবিষ্কারের স্মরণে প্রতি বছর 28শে ফেব্রুয়ারি এই বিশেষ দিনটি উদযাপিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক মাইলফলকই নয়, দেশের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্যও একটি প্রতিশ্রুতিময় দিন।

ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং দূরদর্শী ডক্টর শান্তি স্বরূপ ভাটনগর। সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কাউন্সিল (CSIR)-এর অধীনে বিভিন্ন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি দেশে আধুনিক গবেষণা ও উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ডঃ ভাটনগরের দূরদর্শিতা বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল; তিনি স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগতির মধ্যে একটি মিথোজীবী সম্পর্ক অনুধাবন করেছিলেন। তিনি যে গবেষণাগারগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের অপরিহার্য ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মেলবন্ধন ঘটায়। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব শুধু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিই নয়, জাতির শিল্প উন্নয়নকেও উৎকর্ষের পথে চালিত করেছে।

21শে ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণকারী ডঃ ভাটনগরের জন্মদিন দেশের বৈজ্ঞানিক সাফল্য উদযাপনে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির বাইরে, তাঁর উত্তরাধিকার ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্পে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের স্থায়ী প্রভাবে প্রতিফলিত। 1958 সালে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাপূর্ণ ডক্টর এসএস ভাটনগর পুরস্কার দেশের মধ্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখায় অসামান্য অবদানের শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃতি রূপে চিহ্নিত। এই পুরস্কার জাতির অগ্রগতির দিকদর্শনে একটি আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে, বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার অনুপ্রেরণা দেয়।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনের সার্থকতা বিজ্ঞান প্রচার ও জনপ্রিয়করণ (SCoPE)-এর মধ্যে নিহিত। ভারতের মতো ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় একটি দেশে স্থানীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার অপরিহার্য। SCoPE উদ্যোগ একটি সেতুর মতো সমাজের সকল অংশকে যুক্ত করে, এটি নিশ্চিত করে যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অধিকার সমাজের বিশেষ অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি সর্বসাধারণের অধিকার। সমাজের যে অংশ বিজ্ঞানের আলোর থেকে এখনো বঞ্চিত, এই উদ্যোগই একমাত্র তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের বার্তাকে পৌঁছে দিতে পারে।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনে আমাদের অঙ্গীকার হোক বিজ্ঞান সঞ্চারনার উদ্যোগকে সক্রিয় সমর্থন। এই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এটি সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। বিজ্ঞানের সাফল্যকে সবার মধ্যে ভাগ করে নেওয়া এবং উদযাপন করার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষিত এবং ক্ষমতায়িত ভারত—ডঃ এস এস ভাটনগরের স্বপ্নের ভারত গড়ে উঠবে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, আসুন আমরা একটি বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার গড়ে তোলার জন্য আবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। আমরা আরো সচেষ্ট হই যাতে সারা দেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটে, উদীয়মান বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে এবং দেশব্যাপী গবেষণাগার এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুসন্ধানের দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। একসাথে, আসুন আমরা বিজ্ঞান সঞ্চারনা এবং জনপ্রিয়করণের কাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাই, বিজ্ঞানকে এমন একটি যৌথ প্রচেষ্টায় পরিণত করি যা সব বাধা অতিক্রম করে সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞান কথার সকল পাঠককে জানাই সরস্বতী পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা
বিজ্ঞান কথা

February 2024 | Vol. II | Issue 2

উপদেষ্টামণ্ডলী

স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
প্রোঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ ভূপাতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

এবং

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

আন্ত্রিক ক্যান্সারে অ্যাসপিরিন

একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে অ্যাসপিরিন অন্ত্রের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে অন্ত্রের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের পরিসংখ্যান বিশ্বের তৃতীয়। বার্ষিক প্রায় 19 লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং বার্ষিক প্রায় 9 লক্ষ রোগী মারা যায়। ফলে চিকিৎসক ও গবেষক মহলে এই রোগ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। সম্প্রতি দেখা গেছে, অ্যাসপিরিন বা এসিটাইলস্যালিসাইলিক অ্যাসিড আন্ত্রিক ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। গবেষণায় দেখা গেছে যে কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত রোগীরা যখন কয়েক বছর ধরে কম মাত্রায় অ্যাসপিরিন গ্রহণ করেন, তখন এটি তাদের আন্ত্রিক ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে। উপরন্তু, অ্যাসপিরিন আন্ত্রিক ক্যান্সারের অগ্রগতি রোধ করতে পারে। *সেল ডেথ অ্যান্ড ডিজিজ* জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুযায়ী অ্যাসপিরিন miR-34a এবং miR-34b/c নামক দুটি টিউমার-দমনকারী মাইক্রোআরএনএ অণু উৎপাদনে সহায়তা করে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অ্যাসপিরিন এনজাইম AMPK-কে আবদ্ধ করে এবং সক্রিয় করে, যা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর NRF2-কে এমনভাবে পরিবর্তন করে যে এটি কোষের নিউক্লিয়াসে স্থানান্তরিত হয় এবং miR-34 জিনের প্রকাশকে সক্রিয় করে। এই সক্রিয়করণ সফল হওয়ার জন্য অ্যাসপিরিন অক্সোজিন দ্বারা উৎপন্ন c-MYCকেও দমন করে, যা NRF2-র সক্রিয়করণে বাধা দেয়। ফলে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলিতে মাইগ্রেশন, আক্রমণ এবং মেটাস্ট্যাসিস প্রতিরোধ সম্ভব হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে।

রক্ত পরীক্ষা আত্মহত্যা প্রবণতার পূর্বাভাস দিতে পারে

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা শারীরিক বিপাকের ওপর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব বিষয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য খুঁজে পেয়েছে। যদিও বিষণ্নতার প্রাথমিক লক্ষণগুলি মনস্তাত্ত্বিক, বিজ্ঞানীরা এবং ডাক্তাররা বুঝতে পেরেছেন যে বিষণ্নতা একটি জটিল রোগ যা সারা শরীরে প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, সেলুলার মেটাবলিজমের মার্কার পরিমাপ মানসিক অসুস্থতা অধ্যয়ন এবং তাদের নির্ণয়, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের নতুন উপায় বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান দিয়েগো স্কুল অফ মেডিসিনের গবেষকরা কোষীয় বিপাক এবং বিষণ্নতার মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তারা দেখেছেন যে বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার চিন্তায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে সনাক্তযোগ্য এমন যৌগ উপস্থিত থাকে যা আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা থাকা ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। *ট্রান্সলেশনাল সাইকিয়াট্রি*তে 15 ডিসেম্বর, 2023-এ এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকদের মতে কীভাবে পুরো শরীরের রসায়ন আমাদের আচরণ এবং মনের অবস্থাকে প্রভাবিত করে তা আজ থেকে দশ বছর আগেও সঠিকভাবে জানা ছিল না। কিন্তু বিপাকবিদ্যার মতো আধুনিক প্রযুক্তি আমাদেরকে জৈব রসায়নের ভাষায় কোষের কথোপকথন শুনতে ও বুঝতে সাহায্য করছে। বিষণ্নতার মতো মানসিক অসুস্থতাগুলি মস্তিষ্কের সাথে সাথে দেহেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। যদিও বিষণ্নতায় আক্রান্ত অনেক লোক সাইকোথেরাপি এবং ওষুধের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে, কিছু লোকের ক্ষেত্রে এইসব চিকিৎসার কোনো ফল পাওয়া যায় নি। এই ধরণের হতাশাগ্রস্থ বেশিরভাগ রোগীর মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে 30% জীবনে অন্তত একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করবে এমন পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। গবেষকরা চিকিৎসায় ভালো না হাওয়া হতাশাগ্রস্থ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা যুক্ত রোগীদের রক্ত বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এই ব্যক্তিদের রক্তে সঞ্চালিত শত শত বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে এমন পাঁচটি উপাদান আছে যা এই মানসিক রোগের ক্ষেত্র বায়োমার্কার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উপাদানগুলি পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক কারণ লিঙ্গভেদে বিপাকীয় পদার্থেরও রকমভেদ দেখা যায়। তবে এর মধ্যে কিছু উপাদান উভয় লিঙ্গের জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুমেরুর 'জম্বি ভাইরাস' পরবর্তী অতিমারীর কারণ হতে পারে

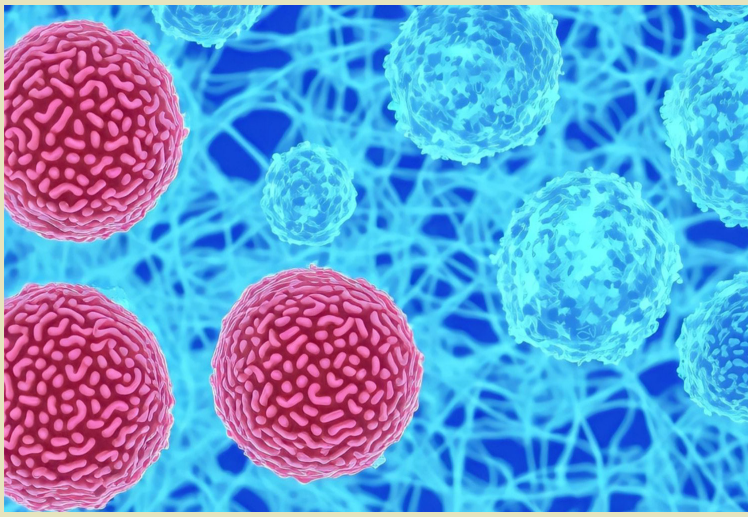

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া করোনা অতিমারীর প্রভাব থেকে এখনো আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি নি, এর মধ্যেই বিজ্ঞানীরা পরবর্তী অতিমারীর সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কবার্তা জারি করেছেন। সুমেরু অঞ্চলে গলে যাওয়া পারমাফ্রস্টের মধ্যে আবদ্ধ প্রাচীন ভাইরাসগুলিকে মুক্তি পাওয়ার ফলে তা ভবিষ্যতে অতিমারীর কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গবেষকরা "জম্বি ভাইরাস"-এর প্রভাব এবং তাঁর ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য জরুরি অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সুদূর অতীতের এই রোগের সম্ভাবনাকে মোকাবেলা করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি আর্কটিক মনিটরিং নেটওয়ার্কের প্রস্তাব করছেন যা প্রাচীন অণুজীব দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রাথমিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারে। এই নেটওয়ার্ক সংক্রামিত ব্যক্তিদের অঞ্চল ছেড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করার প্রয়াসে সংক্রামিত ব্যক্তিদের জন্য পৃথকীকরণে সহায়তা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারবে। বর্তমানে অতিমারীর মোকাবিলায় প্রধানত সেই সব রোগর ওপর বেশি নজরদারি করা হচ্ছে যেগুলো দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তরে ছড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর উল্টোটাও হওয়া সম্ভব এবং এখনো এবিষয়ে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। জীবাণু বিশেষজ্ঞদের মতে সুমেরুর বরফস্তরের মধ্যে কী কী ধরণের ভাইরাস লুকিয়ে আছে তার সঠিক তথ্য এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। এর মধ্যে পোলিও ধরণের ভাইরাসও আছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা 2014 সালে সাইবেরিয়ায় জীবন্ত ভাইরাস আবিষ্কার করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে ভাইরাসগুলি হাজার হাজার বছর পুরানো হওয়া সত্ত্বেও এবং পারমাফ্রস্টে সমাহিত থাকা সত্ত্বেও এককোষী জীবকে সংক্রামিত করতে পারে। উত্তর গোলার্ধের এক পঞ্চমাংশ পারমাফ্রস্টে আচ্ছাদিত, যা মাটি দ্বারা গঠিত এবং দীর্ঘ সময় ধরে হিমাঙ্কেরও কম তাপমাত্রায় আছে। ●

বিক্রম এখন চন্দ্রপৃষ্ঠের মাইলফলক

বর্তমানে চাঁদকে প্রদক্ষিণরত নাসা-র একটি মহাকাশযান সম্প্রতি চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের অবস্থানকে লক্ষ্য করে একটি ছোট আয়না-ভিত্তিক যন্ত্রে উৎপন্ন লেজার বিম পাঠিয়ে দেখেছে যে সেগুলি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এইভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে উপস্থিত বস্তুগুলিকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার একটি নতুন উপায়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নাসা-র Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), যেটি 2009 সালের জুন থেকে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছে, গত 12 ডিসেম্বর এই লেজার রশ্মি পরীক্ষা চালায়। নাসা এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) উভয়ই এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। লেজার রেট্রোরিফ্লেক্টর অ্যারে (এলআরএ) থেকে প্রতিফলিত হবার জন্য বিমগুলি তৈরি করা হয়েছিল। মাত্র 20 গ্রাম ওজনের এই এলআরএ এই পরীক্ষার জন্য সঠিকভাবে বিক্রমের উপর রাখা হয়েছিল। ইলেকট্রনিক্স উপকরণ নেই এমন যন্ত্রের শক্তি সরবরাহ বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না এবং এইভাবে বছরের পর বছর, এমনকি কয়েক দশক পর্যন্ত কার্যকর থাকতে পারে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিক্রমের সাতটি এবং প্রজ্ঞান রোভারের দুটি পেলোড এখন পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ফলাফল দেখে নিশ্চিত হাওয়া গেছে যে এদুটি সঠিকভাবে কাজ করছে। মহাকাশবিজ্ঞানীরা মনে করছেন এর পরবর্তী পদক্ষেপে কৌশলটির আরো উন্নতিসাধন করা যাবে যাতে ভবিষ্যতে রেট্রোরিফ্লেক্টর ব্যবহারকারী সকল মহাকাশ মিশনের জন্য এটি একটি রুটিন প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বিক্রম চাঁদে মোতায়েন করা প্রথম এলআরএ নয়। এই ধরনের যন্ত্র অ্যাপোলো মিশন দ্বারাও স্থাপন করা হয়েছিল এবং এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী থেকে আলোক তরঙ্গ প্রেরণ এবং এই যন্ত্রগুলি দ্বারা প্রতিফলিত বিমগুলিকে পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়েছিল যে চাঁদ প্রতি বছর প্রায় 1.5 ইঞ্চি হারে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের উপস্থিতির বিশেষত্ব হল, বিক্রম বাকি এলআরএ গুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট, এবং আধুনিক উপকরণ ও ব্যবস্থা সম্বলিত। উপরন্তু, এটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে উপলব্ধ একমাত্র এলআরএ। ●

রামন এফেক্ট আবিষ্কারের দিনগুলি

ভূপতি চক্রবর্তী

কোলকাতা শহরের প্রায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শহরের একটি বিখ্যাত কমার্স কলেজ, (গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্র্যাশান) এর ঠিকানা 210 বিপিন বিহারি গাঙ্গুলি স্ট্রীট, যে রাস্তার আগেকার নাম ছিল বৌবাজার স্ট্রীট। অনেকে হয়ত জানেন না যে, আজ থেকে ছিয়ানব্বই বছর আগে 1928 সালে একই জায়গায় অবস্থিত ছিল ভারতের সবথেকে প্রাচীন বিজ্ঞান গবেষণাগার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অব সায়েন্স বা সংক্ষেপে আই এ সি এস। আর সেই সময় সেখানকার গবেষণাগারে তার ছাত্রদের নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত কাজ করে চলেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের তখনকার পালিত অধ্যাপক স্যার সি ভি রামন।

1928 সালের ফেব্রুয়ারির 28 তারিখে অধ্যাপক রামন কিছুটা দীর্ঘ একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন লন্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা ‘নেচার’ এ। তার একটি গবেষণার ফল এর মধ্যে দিয়ে দ্রুত বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য ছিল তার এই প্রয়াস।

তবে কেবল গবেষণাপত্র পাঠিয়েই রামন থেমে থাকেন নি। রামন তার কাজের মৌলিকত্ব নিয়ে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি তার এই আবিষ্কারের খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশেও আগ্রহী ছিলেন। কোন গবেষণা পত্রিকায় একটি গবেষণাকাজ প্রকাশিত হয় একই ক্ষেত্রের গবেষক-বিজ্ঞানীদের দ্বারা মূল্যায়নের পরে। তাই গবেষণা পত্রিকায় কোন কাজ প্রকাশ করার পরেই ঐ বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে যাওয়া একটি প্রচলিত প্রথা। এই প্রথা এখনও কমবেশি মেনে চলা হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রামন একদিকে ওই 28শে ফেব্রুয়ারি নেচার পত্রিকায় তার প্রাপ্ত ফল প্রকাশনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন এবং একই সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন তার এই বিশেষ পর্যবেক্ষণের কথা, যার মধ্যে দিয়ে হদিশ মিলেছে এক নতুন ধরণের বিক্ষেপণ প্রক্রিয়ার। তাই 1928 সালের 29শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা একটি সংবাদপত্রে দেখা গেল এক বিশেষ খবর, যেখানে স্যার সি ভি রামনের নতুন আবিষ্কারের কথা লেখা হয়েছে। লক্ষ

স্যার সি ভি রামন

বৌবাজার স্ট্রীটে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অব সায়েন্সের আদি প্রবেশপথ

জার্মানিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকাজে অনেকদিন ধরে যুক্ত রয়েছে ড রাজিন্দর সিং। তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সঙ্গে আর একটি বিশেষ ঘোষণার কথা জানিয়েছেন। ফটোঃ ড রাজিন্দর সিং

NEW THEORY OF RADIATION

PROF. RAMAN'S DISCOVERY

(ASSOCIATED PRESS OF INDIA.)

CALCUTTA, Feb. 29.

Prof. C. V. Raman, F. R. S., of the Calcutta University, has made a discovery which promises to be of fundamental significance to physics. It will be remembered that Prof. A. H. Compton of the Chicago University was recently awarded the Nobel Prize for his discovery of the remarkable transformation which X-rays undergo when they are scattered by atoms. Shortly after the publication of Prof. Compton's discovery, other experimenters sought to find out whether a similiar transformation occurs also when ordinary light is scattered by matter and reported definitely negative results. Prof. Raman with his research associates took up this question afresh, and his experiments have disclosed a new kind of radiation from atoms excited by light.

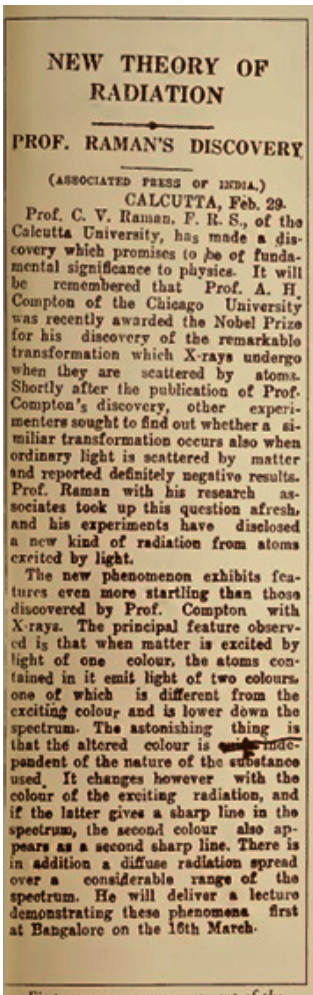

The new phenomenon exhibits features even more startling than those discovered by Prof. Compton with X-rays. The principal feature observed is that when matter is excited by light of one colour, the atoms contained in it emit light of two colours, one of which is different from the exciting colour and is lower down the spectrum. The astonishing thing is that the altered colour is quite independent of the nature of the substance used. It changes however with the colour of the exciting radiation, and if the latter gives a sharp line in the spectrum, the second colour also appears as a second sharp line. There is in addition a diffuse radiation spread over a considerable range of the spectrum. He will deliver a lecture demonstrating these phenomena first at Bangalore on the 16th March.

First newspaper announcement of the Discovery of the Raman Effect made on 28th Feb. 1928

SOUTH INDIAN SCIENCE ASSOCIATION, BANGALORE.

EIGHTH ANNUAL SESSION.

FRIDAY - 16th March 1928: -

6 P.M. Welcome Address by the President of the Association.

6-15 P.M. Inaugural Address by Prof.C.V.Raman,F.R.S.,

SUBJECT: -

"A new Radiation".

Notice of the historic lecture in Bangalore where the Raman effect was announced (16th March 1928)

First page of lecture-published on 31st March 1928 in the Indian Journal of Physics

Extract from K S Krishnan's diary

করার বিষয় যে সংবাদপত্রের স্বল্প পরিসরে রামন ক্রিয়ার কথা খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ পাঠক হয়ত কম্পটন ক্রিয়া জানেন না তবে রামন আবিষ্কৃত এই নতুন ধরণের বিক্ষেপণটির যে কম্পটন ক্রিয়ার সঙ্গে একটি বিশেষ মিল রয়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সংবাদটি পরিবেশনে অধ্যাপক রামনের একটা প্রচ্ছন্ন ভূমিকা টের পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত তার কোন ঘনিষ্ঠ ছাত্র রিপোর্টটি তৈরি করে দিয়েছেন কারণ তা না হলে এইরকম সহজ ভাষায় রামন ক্রিয়ার মূল ধারণাটা বোঝানো শক্ত।

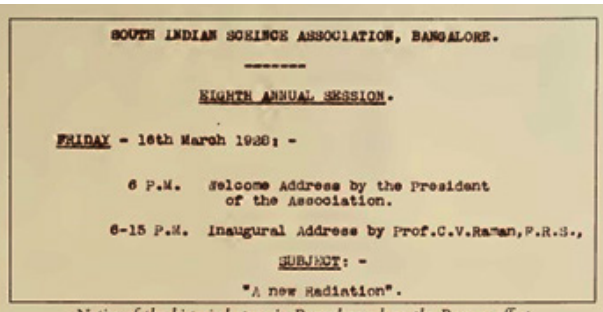

1928 সালের 28শে ফেব্রুয়ারি রামন যে সংক্ষিপ্ত পেপারটির মধ্যে দিয়ে তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন সেই পেপারটির সহ লেখক ছিলেন তারই এক ছাত্র কে এস কৃষ্ণান। গবেষণা পত্রিকার পরিভাষায় এই ধরণের সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পেপারকে বলা হয় ‘লেটার’ (Letter)। এই ধরণের প্রকাশনায় সাধারণত কোন রেফারেন্স বা সাহায্যসূচিও অনেক সময় থাকে না। নেচারের 1928 সালের 31শে মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত ওই লেটারের শিরোনাম ছিল “ A New Type of Secondary Radiation” যার বাংলা করলে লেখা যায় ‘একটি নতুন ধরণের গৌণ বিকিরণ’। ছিল না সেখানে কোন সাহায্যসূচিও।

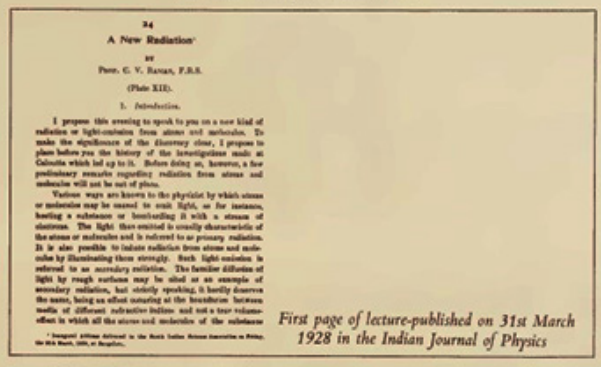

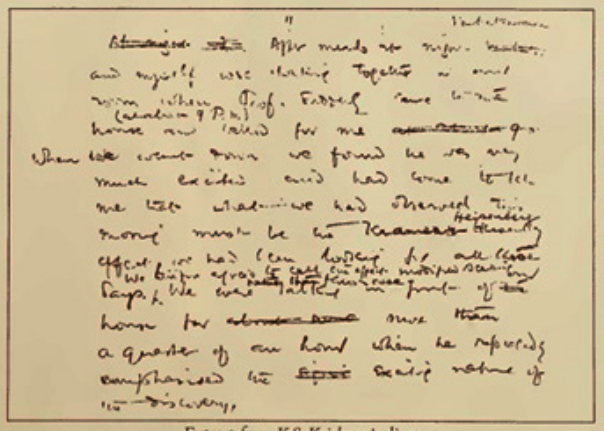

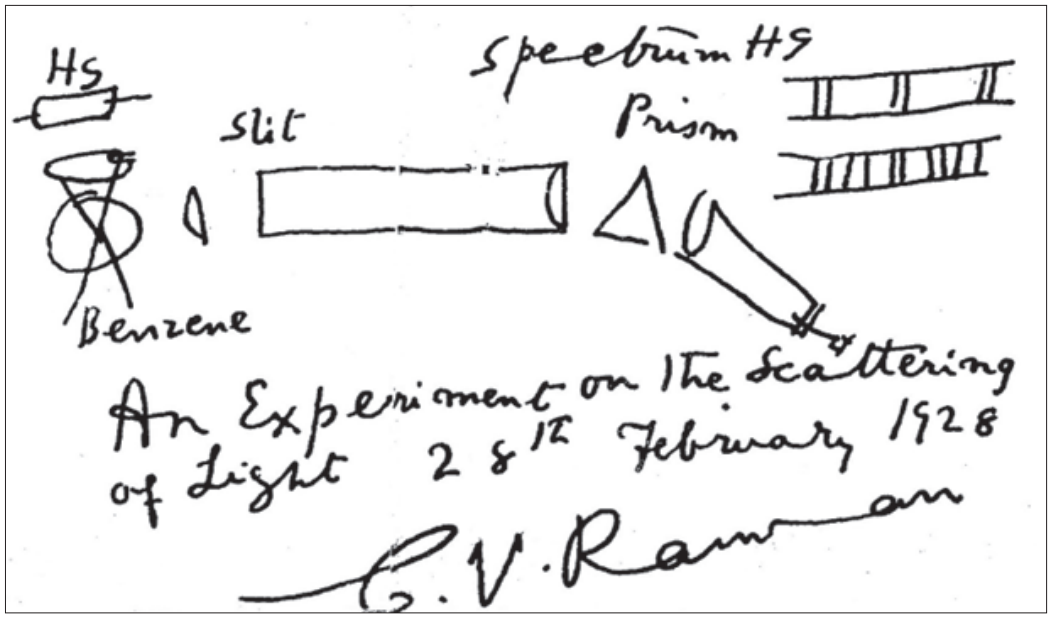

সংবাদপত্রে পরিবেশনার জন্য রামন নিজে হাতে একটি স্কেচ করে দিয়েছিলেন ওই ২৮শে ফেব্রুয়ারি। এখানে খুব সংক্ষেপে পরীক্ষা-ব্যবস্থাপনা তুলে ধরে কী ধরণের বর্ণালী দেখা যাবে তা ওপরে ডান দিকে হাতে এঁকে দেখিয়েছেন স্যার সি ভি রামন। ফটোঃ ড রাজিন্দর সিং

কে এস কৃষ্ণান

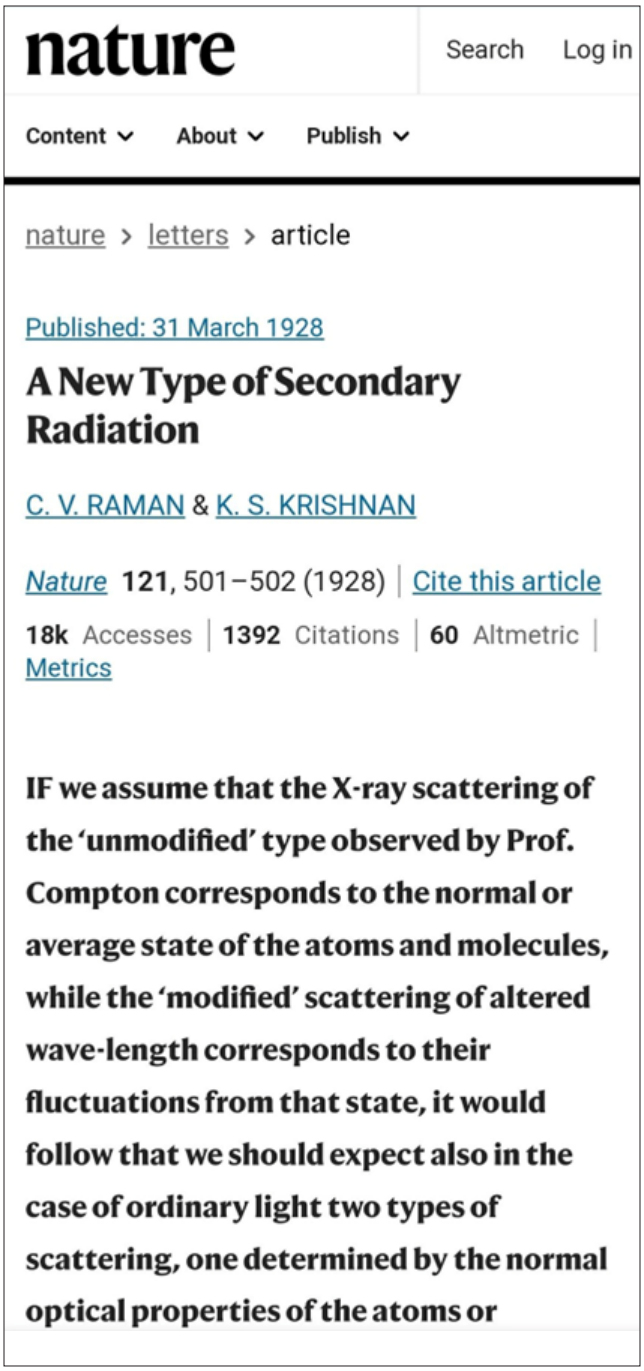

nature Search Log in

Content About Publish

nature > letters > article

Published: 31 March 1928

A New Type of Secondary Radiation

C. V. RAMAN & K. S. KRISHNAN

Nature **121**, 501–502 (1928) | Cite this article

18k Accesses | **1392** Citations | **60** Altmetric | Metrics

IF we assume that the X-ray scattering of the 'unmodified' type observed by Prof. Compton corresponds to the normal or average state of the atoms and molecules, while the 'modified' scattering of altered wave-length corresponds to their fluctuations from that state, it would follow that we should expect also in the case of ordinary light two types of scattering, one determined by the normal optical properties of the atoms or

নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত পেপার

সেই 1928 সালের 16 ই মার্চ অধ্যাপক রামন তার এই নতুন আবিষ্কার নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বেছে নিলেন ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স-এর মঞ্চ। সেই ঘোষণাও এখানে ফটোতে দেখানো হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তৃতার শিরোনাম "A new Radiation" বা বাংলায় বলা যায় "একটি নতুন বিকিরণ"। সেই সময়কার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক রামন তার এই নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য রাখার জন্য কোলকাতার বদলে ব্যাঙ্গালোরকে বেছে নেওয়াটা কিছুটা বিস্ময়ের। কারণ কোলকাতা সেই সময় ভারতবর্ষের নিরিখে পদার্থবিদ্যা চর্চার খুব গুরুত্বপূর্ণ এক কেন্দ্র। তবে রামন তার গবেষণাকাজের ওপরে বিস্তৃত নিবন্ধটি প্রকাশ করেন কোলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কালটিভেশান অব সায়েন্স থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স'-এ। সেই সময় এই গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামন নিজেই।

রামন তার গবেষণাকাজ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করলেন 1928 সালের 31 শে মার্চ ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স এ। আর সেই প্রকাশনা ছিল তার 16 ই মার্চে ব্যাঙ্গালোরে পরিবেশিত বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে লেখা। রামন প্রায় দশ বছরের বেশি সময় অতি উচ্চ সরকারি পদে কাজ করার সুবাদে সেই বিষয়গুলিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন যা তার কাজকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে খুবই প্রয়োজন ছিল। যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্সে তার গবেষণাপত্র প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, তৈরি করেছেন সেই গবেষণাপত্রের কতগুলি রিপ্রিন্ট। রিপ্রিন্টের অর্থ হচ্ছে যে ওই বিশেষ গবেষণাপত্রটিকে আলাদা করে নিয়ে পুস্তিকা তৈরি। এই পুস্তিকা সহজে অন্য কোন বিজ্ঞানীকে বা সংবাদমাধ্যমে দেওয়া যায়। লক্ষ করার বিষয় যে এই রিপ্রিন্ট রামন ছাপিয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত অধ্যাপকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আর এখানে যে রিপ্রিন্টের চিত্রটি দেওয়া হয়েছে সেখানে বাঁদিকে কোনায় লেখা থেকে

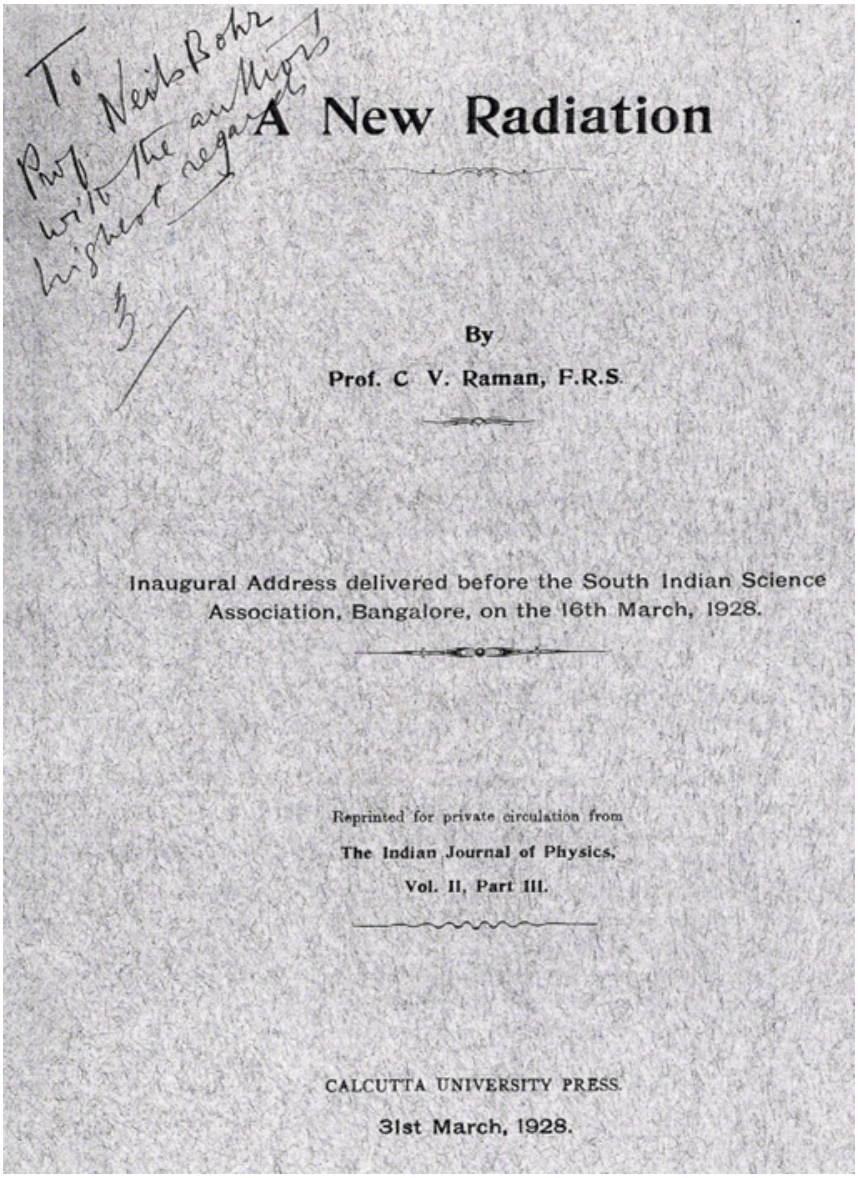

To Prof. Niels Bohr with the author's highest regards

A New Radiation

By

Prof. C V. Raman, F.R.S.

Inaugural Address delivered before the South Indian Science Association, Bangalore, on the 16th March, 1928.

Reprinted for private circulation from
The Indian Journal of Physics,
Vol. II, Part III.

CALCUTTA UNIVERSITY PRESS.
31st March, 1928.

ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স-এ প্রকাশিত রামনের পেপারের রিপ্রিন্ট

বোঝা যাচ্ছে যে তিনি এই রিপ্রিন্ট উপহার দিচ্ছেন এক নোবেলজয়ী ড্যানিশ পদার্থবিদ নীলস বোর কে। আর এইভাবেই রামন তার কাজের বিষয়টি দ্রুত পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই সময়কার বিজ্ঞানী মহলের সর্বোচ্চ স্তরে। মনে রাখতে হবে যে 1930 সালে রামন যখন পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পান তখন তাঁর মনোনয়নকারীদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন তাঁর আগের নোবেলজয়ী। এদের মধ্যে লর্ড রাদারফোর্ড, আর্থার কম্পটন, নীলস বোর প্রভৃতি অন্যতম।

1987 সাল থেকে প্রতি বছর আমাদের দেশে আমরা 28শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ 1928 সালে রামন ক্রিয়া আবিষ্কারের দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালন করে আসছি। ইওরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশের বাইরে কোন বিজ্ঞান বিষয়ে রামন ছিলেন প্রথম নোবেলজয়ী। একটি পরাধীন দেশের এক বিজ্ঞানীর পক্ষে সেই দেশে বসে এতবড় এবং এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা কতটা কঠিন তা সম্ভবত আজ প্রায় একশ' বছর পরে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, রামন কেবল বিশ্বমানের গবেষক ও বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি তার কাজকে সঠিক মঞ্চে তুলে ধরার কাজেও ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, যা তার সমসাময়িক ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তেমনভাবে দেখা যায় না। আজকের দিনে অনেক বিজ্ঞানীকেই তার গবেষণাকাজের সঙ্গে সঙ্গে তার যথাযথ পরিবেশনার ও উপস্থাপনার কথা ভাবতে হয়। কিন্তু সেই 1928 সালে এই ধরণের মানসিকতা ও দক্ষতার বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে ছিল যথেষ্ট অভাব। গবেষণাগারে উচ্চমানের কাজ করার পাশাপাশি তার যথাযথ প্রকাশনার ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীমহলে তাকে তুলে ধরার কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমাদের এই বিষয়টিও মনে রাখতে হবে, বিশেষ করে বিজ্ঞানী রামনকে ভালভাবে বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে তার উচ্চপদে কাজ করে আসা এক সরকারি পদাধিকারীর সত্ত্বাকেও। আর এখানেই রামন অনন্য। ●

__সাহায্যসূত্রঃ__ ব্যবহৃত চিত্র আই এ সি এস-এর আর্কাইভ, ডঃ রাজিন্দর সিং এর সংগ্রহ, উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহিত।

লেখক __ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী__ কলকাতার সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক।
ইমেল: chakrabhu@gmail.com

ভারতীয় গবেষণাগারের জনক

অমিতেশ ব্যানার্জী

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে গড়ে তুলতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকাঠামো যা দেশকে নিয়ে যাবে সার্বিক অগ্রগতির পথে। এই পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হলে সবার আগে দরকার গবেষণাগার গড়ে তোলা। একে একে গড়ে উঠলো নয়াদিল্লির জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার, পুনের জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার, মহীশূরের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি, জামশেদপুরের জাতীয় ধাতুবিদ্যা গবেষণাগার, ধানবাদের সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রমুখ গবেষণাকেন্দ্র। স্থাপিত হল বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ। এইসব সংস্থার গড়ে ওঠার মূলে যার অবদান ছিল সর্বোচ্চ, তিনি হলেন ভারতীয় গবেষণাগারের জনক স্যার শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর।

শান্তি স্বরূপ ভাটনাগরের জন্ম 1894 সালের 21শে ফেব্রুয়ারী অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাবের শাহপুর জেলায়। খুবই অল্প বয়সে পিতা পরমেশ্বরী সহায় ভাটনাগারের মৃত্যু হলে তিনি মায়ের সাথে উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং সেখানেই তার শৈশব কাটে। তার মাতামহ ছিলেন রেলওয়ের নির্মাণকার্যে দক্ষ একজন প্রকৌশলী। তার প্রভাবেই শিশুকাল থেকেই শান্তি স্বরূপের মনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ জন্মায় যা ক্রমে তার জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

ছোটবেলা থেকেই কারিগরি বিষয়ে যেমন যান্ত্রিক খেলনা, ইলেকট্রনিক ব্যাটারি, তারযুক্ত টেলিফোন ইত্যাদি তৈরিতে তার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। পাশাপাশি হিন্দি ও উর্দু ভাষায় কবিতা রচনায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। সিকান্দ্রাবাদ স্কুলে প্রাথমিক পাঠ শেষে ভর্তি হন দয়ানন্দ এংলো বৈদিক স্কুলে। বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন করে 1911 সালে লাহোরের দয়াল সিং কলেজে ভর্তি হন। স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের পর যায় কলেজটি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে ছাত্রাবস্থায় তিনি ‘সরস্বতী স্টেজ সোসাইটি’র সদস্য হন এবং অভিনেতা হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি ‘করামতি’ নামে একটি উর্দু একাঙ্ক নাটক লেখেন এবং এর ইংরেজি অনুবাদ 1912 সালের সেরা নাটক বিবেচিত হওয়ায় তিনি সরস্বতী স্টেজ সোসাইটি পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। দয়াল সিং কলেজ থেকে 1913 সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর 1916 সালে ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং এখান থেকেই 1919 সালে তিনি রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনে প্রথম কিছুদিন তিনি ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগের ডেমনস্ট্রেটরের ও পরে কিছুদিন দয়াল সিং কলেজে সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটরের কাজ করেন। পরে দয়াল সিং কলেজ ট্রাস্ট থেকে বৃত্তি পেয়ে লন্ডন যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনে অধ্যাপক ফ্রেডরিক জি ডনানের অধীনে গবেষণা করে ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। 1921 খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসার পর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং তিন বৎসর কাজ করেন। এখানে “বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত” রচনার মধ্যে দিয়ে অধ্যাপক শান্তি স্বরূপের

নেহেরু, ভাটনাগর এবং টাটা

মধ্যে বিজ্ঞানের পাশাপাশি কবি সত্তারও পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত রসায়নের অধ্যাপক এবং কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিচালক হিসাবে লাহোরে চলে যান। তার কর্মজীবনের এই অংশটি ছিল মূলত গবেষণাকেন্দ্রিক। তার গবেষণার কাজে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল ইমালসন, কলয়েড, শিল্প রসায়ন প্রভৃতি। চুম্বক-রসায়নের ক্ষেত্রে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া অধ্যয়নে চুম্বকত্বের ব্যবহার বিষয়ে তার মৌলিক অবদান অনস্বীকার্য। 1928 খ্রিস্টাব্দে তিনি এবং তার ছাত্র কে এন মাথুর যৌথভাবে 'ভাটনগর-মাথুর ম্যাগনেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স ব্যালান্স' প্রস্তুত করেন যার দ্বারা সেসময়ে চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিমাপে এক সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল যন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। 1931 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের অ্যাডাম হিলগার অ্যান্ড কোম্পানি ব্যবসায়িকভাবে এই যন্ত্রটি বাজারে নিয়ে আসে। অধ্যাপক ভাটনাগর এবং কে এন মাথুরের লেখা বই Physical Principles and Applications of Magnetochemistry আজও চৌম্বক-রসায়ন বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্প সমস্যা সমাধানে অধ্যাপক ভাটনগরের উল্লেখযোগ্য অবদান আখের খোসা থেকে গবাদি পশুর খাদ্য তৈরী, অপরিশোধিত তেলকে নানা উপায়ে শোধিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার। তেল শোধনকারী সংস্থা ড্রিলিং করার সময় কাদা ও লবণাক্ত জলের কারণে নানা সমস্যার সম্মুখীন হত। সেই সমস্যা অধ্যাপক ভাটনাগর কলয়েড রসায়নের মাধ্যমে সমাধান করেছিলেন। তিনি এক প্রকার আঠা আবিষ্কার করেন যার ব্যবহারে কাদা জলে বসে যাওয়া যন্ত্রগুলি সহজে আটকে না গিয়ে সহজ গতিতে ড্রিলের কাজ সম্পন্ন করতে পারত। অধ্যাপক ভাটনগরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল 'দিল্লি ক্লথ অ্যান্ড জেনারেল মিলস', কানপুরের 'জে কে মিলস লিমিটেড', লায়াল্লাপুরের 'গণেশ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড', বোম্বের 'টাটা অয়েল মিলস লিমিটেড' এবং 'স্টিল ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং লিমিটেড' প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রের বহু শিল্প সমস্যার সমাধান।

শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর শিল্প-মহলের গবেষণা তহবিল থেকে কোনো ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা নিতেন না। পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সুবিধা জোরদার করার পক্ষে শিল্প-মহলের সাহায্যের দাবি রাখতেন। তার এই কাজের জন্য বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা 1934 খ্রিস্টাব্দে শান্তি স্বরূপ ভাটনগরকে চিঠি লিখে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শান্তি স্বরূপ ভাটনগর ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকাঠামো এবং নীতি নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। 1947 খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর প্রয়াসে দেশে বিজ্ঞান গবেষণায় এবং শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির জন্য গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ তথা কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক

জন্মশতাব্দী স্মারক ডাকটিকিট

... ষোড়শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অথ মিসিসিপি কথা

অচিন্ত্য পাল

স্কুল জীবন থেকে আমরা আমেরিকার মিসিসিপি নদীর সাথে দু'ভাবে পরিচিত—এক, ভূগোল বইতে পড়া তথ্য যে—যুক্তভাবে মিসৌরী-মিসিসিপি বিশ্বের দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে চতুর্থ আর দুই, হাই স্কুলের অঙ্ক বই তে permutation-combination এর বহুপরিচিত এই ধরণের প্রশ্ন "How many arrangements of the letters in MISSISSIPPI have at least 2 adjacent S's?"

তাই সাম্প্রতিক কালে এই মিসিসিপি এবং আর এক বহুশ্রুত নদী ইওরোপের ড্যানিয়ুব কে চোখের সামনে দেখে স্বাভাবিকভাবেই রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। কানাডার সীমান্তবর্ত্তী মিনেসোটা রাজ্যের Lake Itasca থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর-দক্ষিণে বহমান মিসিসিপি নদী গোটা আমেরিকা দেশকে পূর্ব-পশ্চিম ভাগে ভাগ করেছে। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিমের মন্ট্যানা রাজ্যের Rocky Mountain হল মিসৌরির উৎসস্থান আর এই নদী অনেক রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিসৌরি আর ইলিনয় রাজ্যের সীমানায় সেন্ট লুই শহরের উত্তরে মিসিসিপির সাথে মিলিত হয়েছে (চিত্র 1)।

মিসিসিপির নামে একজনের কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে—তিনি মার্ক টোয়েন (আসল নাম Samuel Langhorne Clemens)—এই নদীর পটভূমিতে তাঁর লেখা অনেকেই পড়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিসিসিপি বা অন্য নদীতে যাতায়াত করা স্টীমবোটের ছবিও তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদে দেখা যায়। সেই বোটের নিরাপদ নাব্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত

চিত্র 1

চিত্র 2

হওয়ার জন্য পাইলটের ডাক থেকে লেখকের ঐ ছদ্মনামের উৎপত্তি—Twain মানে two fathoms অর্থাৎ বারো ফুট গভীরতা। কিছুকালের শিক্ষানবিশীর পর মার্ক টোয়েন নিজে দু'বছরের মত ঐ ধরণের বোটের প্রধান নাবিক ছিলেন। মিসিসিপি এবং তার অন্যান্য অববাহিকার উপর বেশ কিছু আধুনিক বিলাসবহুল স্টীমবোট দেখা যায়—হয়তো সেগুলি এখন স্টীমে চলে না—তবু তারা বিগত দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই স্টীমবোট গুলির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি যে জলযান নদীর সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়ে দেয়, বিশেষতঃ বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, তা হল পণ্যবাহী বার্জ (barge) (চিত্র 2)। বিপুল পরিমাণ পণ্য পিছন দিক থেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এই ধরণের জলযান ব্রহ্মদেশের (Burma, অধুনা Myanmar) ইরাবতী নদীতেও দেখতে পাওয়া যায়। মিসৌরির তুলনায় মিসিসিপির নাব্যতা ভাল হওয়ায় আর বেশকিছু সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার জন্য এই নদীর উপর দিয়ে পণ্যবাহী বার্জ গুলির চলাচল বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক। রেল বা স্থলপথের তুলনায় জলপথে পণ্য পরিবহনের সুবিধা এবং কার্যকারিতা বার্জ কোম্পানী গুলির ওয়েবসাইট বিশদভাবে প্রচার করে। শোনা যায় মায়ানমারে পরিবহনের কোন খরচ ছাড়াই বনাঞ্চল থেকে কাটা বড় বড় গাছের গুঁড়ি নদীর নিম্নধারায় প্রবাহিত জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত।

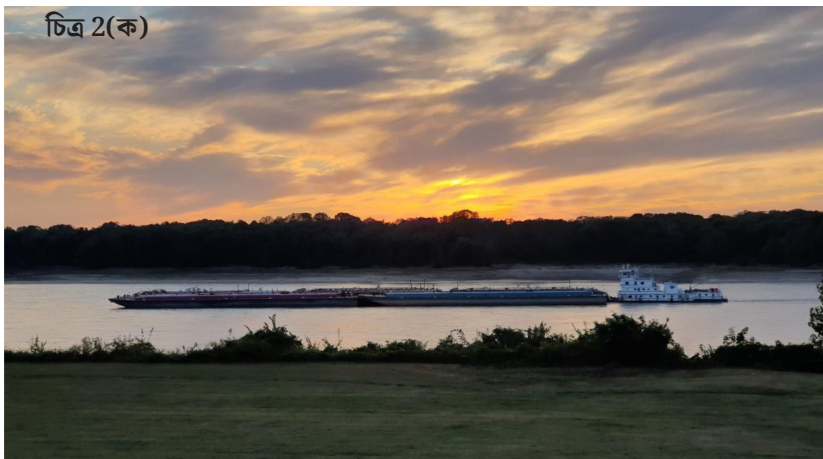

চিত্র 2(ক)

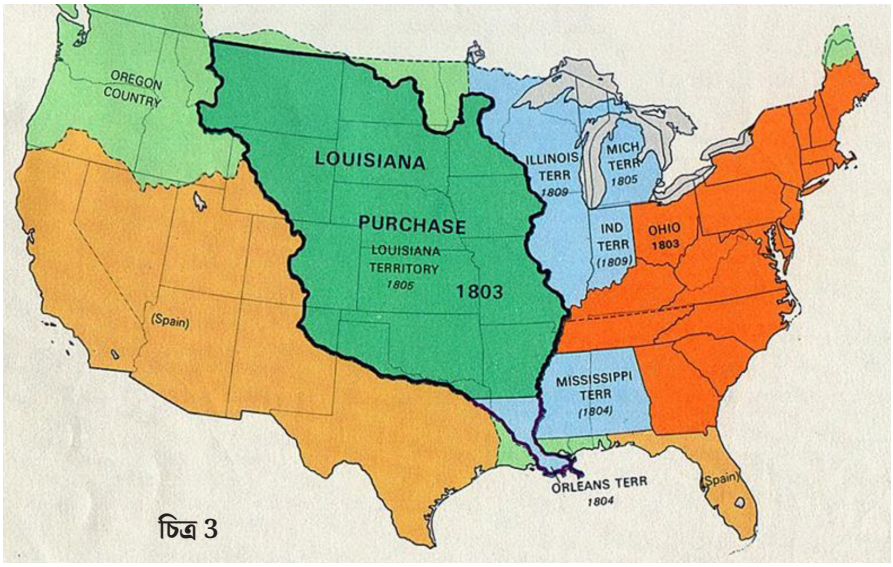

চিত্র 3

ছ'হাজার কিলোমিটারেরও বেশী দৈর্ঘ্য জুড়ে প্রবাহিত বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ মিসৌরী-মিসিসিপি নদীদ্বয় যে শুধু আমেরিকার দীর্ঘতম তাই নয়, এই নদী দুটি এই দেশের স্বল্পপরিসর (সাড়ে তিনশ' বছর) অথচ বিরাট অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা এই নিবন্ধে প্রধানতঃ মিসিসিপি নদীর সম্বন্ধেই আলোচনা করব—তার কারণ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (civil war) পর বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যিক দিক থেকে মিসৌরির তুলনায় মিসিসিপির জলপথ বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যদিও প্রথম দিকের অন্বেষণ-অনুসন্ধানের সময়ে মিসৌরির জলপথ ও জলসম্পদ যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অভিযানের আগে এর দুই ধারে বসবাস এবং জীবিকা ও পরিবহণের জন্য নদীটিকে ব্যবহার করত এই দেশের আদি বাসিন্দারা যাদের পরিভাষায় নেটিভ ইন্ডিয়ান। প্রাথমিক ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা মিসিসিপি অববাহিকার সাহায্যে নদীর দু'ধারের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল অন্বেষণ করে এবং নদীর উত্তরের প্রবাহ ধরে অভিযান চালিয়ে কানাডা সংলগ্ন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের সীমানার কিছুটা নির্ধারণ করে। ইতিহাস বলে যে ফরাসীরা এবং স্প্যানীয়ার্ডরা মিসৌরির অববাহিকা সহ নদীর পশ্চিম পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করতে সক্ষম হয় যা 1803 সালে প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন ফ্রান্সের সঙ্গে Louisiana Purchase নামে বিখ্যাত চুক্তির সাহায্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন (চিত্র 3)। দূরদর্শী জেফারসনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মিসিসিপির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নিউ অর্লিন্স এর উপর নিয়ন্ত্রণ অধিকার করা।

আমাদের দেশের উত্তরভাগের বড় নদীগুলির অধিকাংশের উৎস হচ্ছে হিমালয় পর্বতমালা। এক বা একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা, যমুনা, বিপাশা, শতদ্রু, ঝিলাম, ইরাবতী, কালী গন্ডকী, ব্রহ্মপুত্র বা সিন্ধুর মত নদীগুলির উৎপত্তিস্থল উঁচু পর্বতমালা। সেখানকার হিমবাহের বরফ গলে নদীর মূল ধারা তৈরি হয়েছে। পথে তাদের পথের পরবর্তী স্তরে তাদের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক নদী যেগুলি জলের যোগান পাচ্ছে বৃষ্টির জল থেকে। মিসিসিপির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে যে এত বড় একটা নদীর সৃষ্টি কোন পর্বতমালা থেকে হয়নি হয়েছে একটি লেক বা হ্রদ থেকে। আর এতবড় একটা নদী যে লেক থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার নিজের আয়তন বিস্ময়কর রকম ছোট। মিনাসোটা রাজ্যের উত্তর মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত লেক ইটাসাকা (Lake Itasaca) আয়তনে মাত্র 4.7 বর্গ কিমি আর সেখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে এই বৃহৎ নদীটি। তাহলে এমন একটা নদীর উৎস হল কী করে ওই লেক? আসলে ওই লেক হচ্ছে একটি গ্লেসিয়ার লেক।

গ্লেসিয়ার লেক বলতে কী বোঝায়? ভূতাত্ত্বিকদের মতে এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে যখন হিম-যুগের সমাপ্তি ঘটে তখন হিমবাহগুলি ধীরে ধীরে পর্বতমালার দিকে সরে যেতে থাকে। এই সরে যাওয়ার সময় নানা জায়গায় হিমবাহের প্রভাবে ভূতত্ত্বকে তৈরি হওয়া বিশাল গহবরগুলিতে বরফ জমতে থাকে। হিম-যুগের অবসানে ধীরে ধীরে এই

চিত্র 4

North-South flowing Mississippi river bisects **mid-east US area-wise** and **whole of US population-wise**

চিত্র 5

বরফ গলে তৈরী হয় লেক। এই ধরণের লেকগুলির অবস্থান এমন যেখানে শীতকালে তাপমাত্রা যথেষ্ট নেমে যায় এবং জল সচরাচর জমে যায়। সেই সময় লেক থেকে নদীতে আসা জলের ধারা অতি ক্ষীণ হয়ে যায়। তারপর আবার বরফ গলে গেলে গরমে আবার জলের যোগান যায় নদীতে। আর তাছাড়া এখন মিসিসিপিতে এসে যুক্ত হয়েছে ছোট বড় নানা নদী, জলের যোগান আসে সেখান থেকেও।

চিত্র 1 থেকে সহজেই লক্ষণীয় যে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত মিসিসিপি নদী আয়তনের দিক থেকে মধ্য-পূর্ব আমেরিকাকে পূর্ব-পশ্চিমে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। অন্যদিকে জনসংখ্যার নিরিখে এই নদী গোটা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় সমান ভাগে ভাগ করেছে যেহেতু মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্ব কম (চিত্র 4)। চিত্র 5 এ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এই নদী দশটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে—প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে ঐ দশটির মধ্যে ন'টি রাজ্যের পশ্চিম বা পূর্ব সীমানা নির্ধারণ করেছে। (প্রসঙ্গতঃ, কানাডা-সীমান্ত সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সীমানা সম্পূর্ণ বা অংশতঃ অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ রেখা দিয়ে চিহ্নিত (চিত্র 3 বা 4 দ্রষ্টব্য)। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে মিসৌরির তুলনায় মিসিসিপি বেশ কিছু সমৃদ্ধশালী রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে—সঠিকভাবে বলতে গেলে মিসিসিপির জলসম্পদ এবং ভাল নাব্যতাজনিত বাণিজ্যিক সুবিধার জন্যই এই রাজ্যগুলি অনেকাংশে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হতে পেরেছিল।

উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী এই সুদীর্ঘ নদীপথকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়—(1) উৎস Lake Itasca থেকে সেন্ট লুই শহরের উত্তরে মিসৌরি নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত Upper Mississippi, (2) সেখান থেকে দক্ষিণে ইলিনয় রাজ্যের কায়রো শহরের কাছে ওহায়ো (Ohio) নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত Middle Mississippi আর (3) ওহায়ো থেকে নিউ অর্লিন্স এ মেক্সিকো উপসাগরের মোহনা পর্যন্ত Lower Mississippi. এই যাত্রাপথে বিভিন্ন নদী-শাখানদী এসে মিশেছে—মিসৌরি,

চিত্র 6: মিসিসিপির নিষ্কাশিত অববাহিকা এলাকা – হাল্কা নীল রঙের শাখা নদীগুলি মিসিসিপিতে (ঘন নীল রঙ) এসে মিশেছে

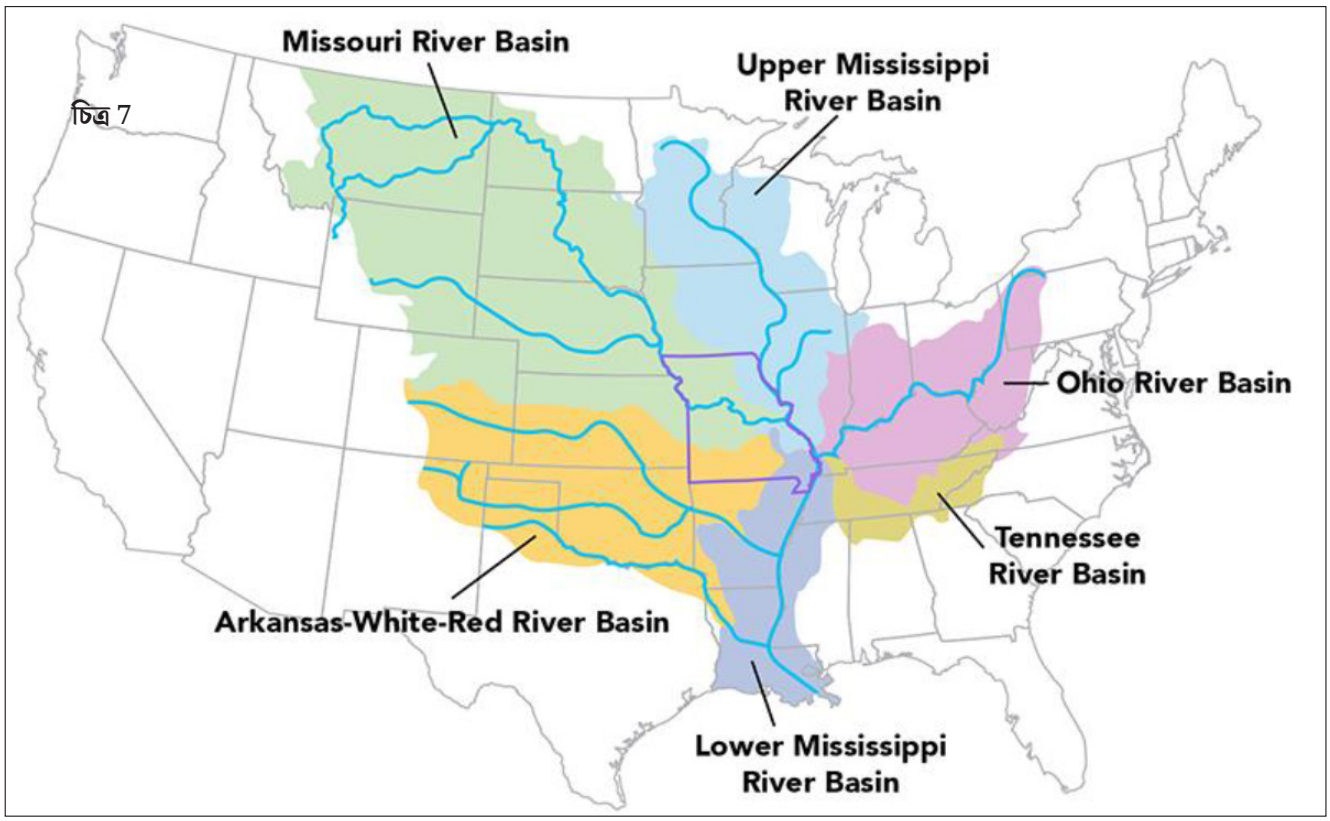

চিত্র 7

ইলিনয়, ওহায়ো, আরকান্স, Red River ইত্যাদি। Lake Itasca থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত 3750 কিমি পাড়ি দিতে সময় লাগে মোটামুটি 90 দিন অর্থাৎ জলস্রোতের গতিবেগ গড়ে ঘন্টায় 1.6–2 কিমি—সাধারণভাবে একজন মানুষের পায়ে চলার বেগের অর্ধেক। এইভাবে বয়ে চলা মিসিসিপি প্রতি সেকেন্ডে আনুমানিক 17000 ঘনমিটার জল আর বর্ত্তমানে প্রতি বছর 160 মিলিয়ন টন পলি (sediment) বহন করে। এই পলির পরিমাণ গত একশ' বছরে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গেছে—এর প্রধান কারণ বন্যা ও ভূমিক্ষয় (soil erosion) নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিপথের বিভিন্ন নদীর উপর তৈরী করা বাঁধ এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন।

কোন নদীর আকার ও আয়তনের আর একটি পরিমাপ হল সেই নদী এবং তার শাখানদী দ্বারা নিষ্কাশিত অববাহিকা (drainage basin) এলাকার পরিমাণ কতখানি। এই পরিমাপ অনুযায়ী মিসিসিপি 32টি রাজ্য জুড়ে প্রায় 3 মিলিয়ন বর্গকিমি এলাকা থেকে জল নিষ্কাশন করে, যা মহাদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের 40 শতাংশ। চিত্র 6 এবং 7 থেকে এর কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। তুলনায় ব্রাজিলের আমাজন নদীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হল 7 মিলিয়ন বর্গকিমি এলাকা।

উপরের পরিসংখ্যানগত তথ্য পেরিয়ে আমরা দেখি মিসিসিপি কীভাবে আমেরিকার জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে। প্রথমেই বলতে হয় নদীর দুই ধারের বিস্তীর্ণ উর্বর অববাহিকায় কৃষি-পণ্যের উৎপাদনের কথা। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বিশাল কৃষিব্যবসা শিল্প গড়ে ওঠার জন্য গোটা দেশের কৃষি-পণ্য রপ্তানীর 92 শতাংশ এই এলাকা থেকে হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও এই নদীর বিশেষ ভূমিকা আছে। আমেরিকার মত সুবিশাল দেশের এক থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্থলপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন যথেষ্ট ব্যয়বহুল—সেই নিরিখে বহুদিন থেকে ব্যবহার হয়ে আসা পণ্য পরিবহনের বিকল্প মিসিসিপির বুকে tow-boat দিয়ে পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া বড় বড় বার্জ (barge) গুলি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয় [চিত্র 2, 2(ক)]। এই দিক থেকে দেখলেও মিসিসিপি নদীর গোটা যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষ করে, উত্তর মধ্য আমেরিকার অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অবদান আছে। প্রতি বছর আনুমানিক 175 মিলিয়ন টন পণ্য এইভাবে দুই ধারের সমৃদ্ধশালী রাজ্যের শহরগুলিতে এবং শেষে নিউ অর্লিন্স বন্দরে পরিবাহিত হয়। পরিসংখ্যান বলে লুইসিয়ানা বন্দর এলাকা আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের ব্যস্ততম এবং পণ্যদ্রব্য পরিচালনার দিক থেকে বৃহত্তম বন্দরগুলির অন্যতম। মেক্সিকো উপসাগরের উপর এই বন্দরের ভৌগলিক অবস্থান ও একইসঙ্গে এই অঞ্চল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য্যে ভরপূর হওয়ার জন্য মিসিসিপির নিম্ন বা দক্ষিণ অংশ পেট্রোলিয়ম এবং পেট্রোলিয়ম-জাত পণ্যের রপ্তানী ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এ তো হল বাণিজ্যিক দিক। এই নদী আমেরিকান জাতির জন্য সাংস্কৃতিক সম্পদও বটে। মিসিসিপিকে কেন্দ্র করে বা এর পটভূমিকায় কত না গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে আর অন্যদিকে কানাডার সীমান্তবর্তী মিনেসোটা রাজ্যের মিনিয়াপোলিস থেকে শুরু করে মিসৌরি রাজ্যের সেন্ট লুই পেরিয়ে দক্ষিণে

চিত্র 8: 1541 সালে Hernando de Soto র মিসিসিপি দর্শন ও আবিষ্কার

লুসিয়ানার বদ্বীপ পর্যন্ত এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য বহু চিত্র এবং সঙ্গীত শিল্পীকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে! আমেরিকার বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ও সাফল্যের পিছনে অতীতে আফ্রিকা থেকে বিপুল সংখ্যায় আনা কৃষ্ণাঙ্গদের কঠিন কায়িক পরিশ্রমের নিঃসন্দেহে প্রচুর অবদান আছে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে মধ্য-পূর্ব আমেরিকায়, বিশেষতঃ মিসিসিপির পূর্ব পাড়ের রাজ্য ইলিনয়, কেন্টাকি, টেনেসি, মিসিসিপি, আলাবামা, লুসিয়ানা কৃষ্ণাঙ্গ-প্রধান আর এই এলাকার ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের (ও দেশের ভাষায় Country Music) নামী শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণাঙ্গ।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে, মিসিসিপি নামটি এসেছে নেটিভ ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত মূল শব্দ Misi-ziibi র থেকে যার অর্থ Great River (এবং যার ফরাসী রূপান্তর হল Messipi)। ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে জানা যায় স্প্যানিশ অভিযাত্রী Hernando de Soto 1541 সালে টেনেসির দক্ষিণে মিসিসিপি রাজ্যের কোন একটি জায়গায় নদীকে প্রথম দেখেন (চিত্র 8) এবং তার নামকরণ করেন Río del Espíritu Santo ("River of the Holy Spirit")। ঘটনাচক্রে লেখক এই নিবন্ধ রচনার সময় টেনেসি রাজ্যে মিসিসিপির তীরবর্ত্তী মেম্ফিস শহরে ছিলেন এবং তথ্য ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ 'আবিষ্কার' করেন যে, যে সেতুটি মেম্ফিসকে আরকান্‌স রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে, খুবই যথাযথভাবে তার নাম— Hernando de Soto ব্রীজ। ●

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ তথ্য এবং কিছু ছবি ওয়াইকিপেডিয়া ও ইন্টারনেটের অন্যান্য প্রামাণিক উৎস থেকে নেওয়া।

লেখক ***ডঃ অচিন্ত্য পাল*** *ও এন জি সি-র অবসরপ্রাপ্ত ভূপদার্থবিজ্ঞানী ও লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক। ইমেল: babulan@gmail.com*

একাদশ পৃষ্ঠার পর

অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) এবং অধ্যাপক শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর হন এর প্রথম মহানির্দেশক। তিনি এর বিকাশের জন্য বহু বড় বড় গবেষণাগার স্থাপন করেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সেকারণে তাকে ভারতে গবেষণাগারের জনক বলা হয়। তিনি সেসময়ে ভারতে মোট বারোটি জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিএসআইআর-এ থাকাকালীন তিনি দেশের তরুণ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানমনস্কদের সর্বদাই উৎসাহিত করতেন।

তিনি কর্মজীবনে ভারত সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দফতরে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন ইউজিসি তথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান। ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারির পদ অলংকৃত করার সাথে সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর, অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনেরও প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। ভারতে জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন পর্ষদ (NRDC) স্থাপনে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

কর্মজীবনে তিনি বহুবার পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। 1936 সালে বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নে তার অসামান্য অবদানের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার নিয়োগ করে। 1941 সালে বিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। 1943 সালে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 1954 সালে ভারত সরকার তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে।

1955 সালের 1লা জানুয়ারী দিল্লিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অধ্যাপক ভাটনাগরের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু ছিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথা শিক্ষা পরিকাঠামোর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। 1958 সাল থেকে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অসামান্য গবেষণা, প্রয়োগ বা মৌলিক অবদানের জন্য অধ্যাপক ভাটনাগরের নামাঙ্কিত পুরস্কার প্রদানের সূচনা করেছে যা দেশের মধ্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার বলে পরিগণিত। ●

লেখক ***শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী*** *বিজ্ঞানকর্মী ও এই পত্রিকার সাথে যুক্ত। ইমেল: amiteshbanerjee1@gmail.com*

রূপে তোমায় ভোলাব না

দীপাঞ্জন ঘোষ

এই পৃথিবীতে এমন অনেক গাছপালা আছে, যারা শুধুমাত্র তাদের সৌন্দর্যের কারণে আমাদের মনে ছাপ ফেলে যায়। পরবর্তীকালে, যখনই কোনভাবে তাদের সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়, পুরোনো স্মৃতি আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। এটা এক ধরনের 'দেজা ভ্যু'! যে গাছটির প্রসঙ্গে এই গৌরচন্দ্রিকা, তার সম্পর্কে কয়েকটি লাইন পড়লেই পাঠক সহমত হবেন এবং আমি নিশ্চিত আপনাদের সম্মতি আমার পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতাকে ন্যায্যতা দেবে।

কয়েক বছর আগে, যখন আমি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার কিছু প্রত্যন্ত গ্রাম জুড়ে আদিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত উদ্ভিদের তথ্য অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলাম, তখন পুরুলিয়ার কৃষিক্ষেত্রের কিছু অজানা ফসলের খোঁজ পেয়েছিলাম। বলতে দ্বিধা নেই, সেই সফরে কয়েকটি গাছের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কারণ আমাদের ওদিকে সচরাচর এই সব ফসলের চাষ হয় না। বিভিন্ন রকম ফসলের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, অনেকটা ট্যাঁড়স গাছের মত দেখতে লাল রঙের বৃতি বিশিষ্ট ফুলের একটি গাছ। আমি গাছটির নাম সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না। তবে আমার সঙ্গে সফরকারী পুরুলিয়ার ছেলে সুপ্রিয়র কাছে জেনেছিলাম যে, গাছটির আঞ্চলিক নাম 'মেস্তা' বা 'কুদরুম'। পরে অবশ্য জানতে পারলাম যে, এই গাছটি সারা বিশ্বে 'রোসেল' (Roselle) এবং 'রেড সোরেল' (Red Sorrel) নামে পরিচিত। সম্প্রতি, আমি আবার গাছটির দেখা পেলাম। তবে এবারের অভিজ্ঞতা একটু ভিন্ন মাত্রার। আমার এক তরুণ বন্ধু অনীশ, কিছুদিন আগে প্রজাপতির ছবি তুলতে ওড়িশায় পাড়ি দিয়েছিল। ফিরে আসার পর একদিন অনীশের তোলা ছবি দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, বেশিরভাগ ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে অথবা ফোরগ্রাউণ্ডে (চিত্র 1) ঢুকে পড়েছে লাল রঙের 'রোসেল'।

চিত্র 1: ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এই শীতের ফসলটির চাষ হয়।

রোসেল বা রেড সোরেল (*Hibiscus sabdariffa*) মালভেসি (Malvaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি গুপ্তবীজী দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। রোসেল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। অসমীয়া ভাষায় গাছটি 'চুকিয়ার' নামে পরিচিত; বাংলায় 'টক ট্যাঁড়স'; হিন্দি এবং মারাঠি ভাষায় 'লাল আম্বারি' নামে পরিচিত। কন্নড় ভাষায় 'কেম্পুপুন্ড্রিক'; মালায়ালামে 'পোলেচি'; মণিপুরীতে 'সিলো-সোগড়ি' নামে পরিচিত। আবার তামিলে 'সিমাইকাসুরু' এবং তেলুগুতে 'এরাগমগুরা' নামে গাছটি পরিচিতি লাভ করেছে। অন্যদিকে, রোসেলের সংস্কৃত নাম 'অম্বাস্থাকি', যা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গাছটির দীর্ঘ সম্পর্ককে সূচিত করে।

টক ট্যাঁড়স উষ্ণ এবং আর্দ্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ুর ফসল। তবে হিম ও কুয়াশার প্রতি একটু বেশি সংবেদনশীল। মনে

চিত্র 2: টক ট্যাঁড়সের (*Hibiscus sabdariffa*) ফুল খানিকটা জবা ফুলের মত দেখতে হয়।

করা হয়, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ যেমন, অ্যাঙ্গোলা, মিশর, নাইজেরিয়া ও গিনি; এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন, ভারত, মায়ানমার এবং ফিলিপাইন্স; মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালা ইত্যাদি টক ট্যাঁড়সের আদি নিবাস। যদিও আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে প্রধানত ভোজ্য পাতা এবং তন্তুর জন্য টক ট্যাঁড়সের চাষ করা হয়, তবে সমগ্র ভারতেই প্রাকৃতিকভাবে গাছটিকে জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া, জ্যামাইকা, মেক্সিকো, স্পেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়িকভাবে টক ট্যাঁড়সের চাষ করা হয়।

এক-একটি টক ট্যাঁড়স গাছ অসংখ্য শাখাপ্রশাখাযুক্ত, গুল্মজাতীয় এবং প্রায় 3.5 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। কান্ডটি মজবুত, লালচে রঙের। মূলতন্ত্র সুগঠিত এবং মাটির গভীরে অনুপ্রবেশকারী। প্রতিটি পাতার পত্রবৃন্ত দীর্ঘ, পত্রফলক গাঢ় সবুজ থেকে লাল রঙের, চকচকে, 3–7 টি খন্ডে বিভক্ত এবং ক্রকচ (Serrated) কিনারা বিশিষ্ট। পুষ্পবিন্যাস অনেকটা নিকটাত্মীয় জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*) ফুলের মত, অর্থাৎ একক সাইম (Solitary Cyme) প্রকৃতির। ফুলগুলি (চিত্র 2) আকারে বেশ বড়, ছোট বৃন্তযুক্ত এবং হলুদ রঙের যদিও ফুলের কেন্দ্রভাগ গাঢ় লাল রঙের। ফুলের বৃতিগুলি উজ্জ্বল লাল রঙের, মাংসল এবং দীর্ঘস্থায়ী। টক ট্যাঁড়সের ফল ক্যাপসুল জাতীয়, ডিম্বাকার, ফলত্বক রোমযুক্ত এবং ফলের একদিক ঠোঁটের মত বাঁকান। ফুলের মতই প্রতিটি ফলের (চিত্র 3) চারপাশ বড় বৃতি দিয়ে মোড়া থাকে।

মূলত তন্তু উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিকভাবে টক ট্যাঁড়সের চাষ করা হয়। বর্ষার শুরুতে, অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে, সুরক্ষিত বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। তারপর চারাগুলিকে তুলে নিয়ে এসে বড় জমিতে রোপণ করা হয়। ছায়াময় পরিবেশ টক ট্যাঁড়স চাষের পরিপন্থী। তাই চারিদিক খোলা জমি টক ট্যাঁড়সের চাষের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এছাড়া চারা রোপনের পূর্বে জমিতে আগাছা নির্মূল করা প্রয়োজন। গোবর সার বা প্রয়োজন বুঝে বাণিজ্যিক সারের প্রয়োগ টক ট্যাঁড়সের চাষের জন্য উপকারী। অল্প পরিমাণ ফসফেটের সঙ্গে কম্পোস্ট বা খনিজ সারের আকারে নাইট্রোজেন (প্রায় 45 কেজি/হেক্টর পর্যন্ত) প্রয়োগ করলে টক ট্যাঁড়স চাষে সন্তোষজনক ফলাফল লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম ফুল ফোটার প্রায় 3–4 সপ্তাহ পরে টক ট্যাঁড়সের ফলগুলি সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয় এবং প্রায় দুই মাস ধরে কাজ চলতে থাকে। ফুল আসার সময়ে ফসল কাটা হলে তন্তুর গুণমান সবচেয়ে ভালো হয়। ডালপালাসহ গাছগুলিকে একদম গোঁড়া থেকে কাটা হয়। তারপর বান্ডিল বাঁধা হয় এবং কান্ড থেকে তন্তু বের না হওয়া পর্যন্ত পচান অর্থাৎ জাগ দেওয়া হয়। তন্তুগুলি কাণ্ডের গা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকোন হয়। একজন দক্ষ কর্মী প্রতিদিন প্রায় 36–45 কেজি তন্তু বের করতে পারে। টক ট্যাঁড়সের কান্ড থেকে প্রাপ্ত ফ্লোয়েম তন্তু বা বাস্টতন্তু (1.5 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়) দড়ি তৈরীতে এবং পাটের বিকল্প হিসাবে পাট-কাপড় (Burlap) তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, টক ট্যাঁড়সের কান্ড কাঠকয়লা তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টক ট্যাঁড়সের পাতা, ফল, বীজ এবং শিকড় সহ বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ভারতীয় খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে সবজি হিসেবে পাতা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত

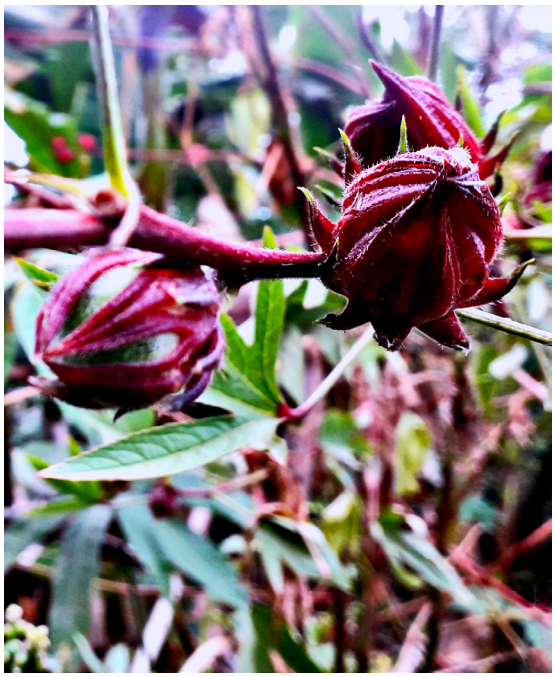

চিত্র 3: প্রতিটি ফলের চারপাশ মাংসল বৃতি দিয়ে মোড়া থাকে।

হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি মানুষজন মাছ, মুরগি এবং মাংসের বিভিন্ন পদ তৈরীতে এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী স্যুপ রান্না করতে টক ট্যাঁড়সের পাতা ব্যবহার করে। রসুন, লবণ এবং কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে টক ট্যাঁড়সের পাতা মিশিয়ে তৈরী বিশেষ চাটনি মহারাষ্ট্রের কৃষক পরিবারগুলিতে দিনের শুরুতে বা জমিতে কাজে যাওয়ার আগে প্রাতরাশের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। আর একটি অনন্য পদ 'গোঙ্গুরা পাচ্চাড়ি', যা সমস্ত অন্ধ্রের খাবারের রাজা হিসাবে পরিচিত, মশলা মেশানো ভাজা টক ট্যাঁড়সের পাতা থেকে তৈরি করা হয়। পাতার পাশাপাশি, কচি ডালপালা এবং ফলগুলিও স্যুপ এবং কাঁচা সালাড তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সবুজ শাক হিসাবে রান্না করা হয় অথবা কখনও কখনও মাংসের পদ রান্নায় ব্যবহার করা হয়।

টক ট্যাঁড়সের তাজা মাংসল বৃতিগুলি (চিত্র 4) ওয়াইন, জুস, রিফ্রেশিং পানীয়, জ্যাম, জেলি, সিরাপ, জেলাটিন, পুডিং এবং কেক তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। শুকনো টক ট্যাঁড়সের বৃতি চা তৈরীতে, মশলা হিসাবে কিংবা আইসক্রিম, শরবত, মাখন, সস, চাটনি এবং পিঠে তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। লাল বৃতিগুলিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রূপে গসিপেটিন (Gossypetine), হিবিসেটিন (Hibiscetine), এবং সাবডারেটিন (Sabdaretine) নামক ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে। এছাড়াও বৃতিগুলি রাইবোফ্লাভিন, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, নিয়াসিন, ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম এবং আয়রনে সমৃদ্ধ, যা পুষ্টিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

টক ট্যাঁড়সের বীজে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং সেগুলিকে আগুনে সেঁকে নিয়ে গুঁড়ো করে তারপর স্যুপ ও সসে ব্যবহার করা যায়। ভাজা বীজ কফির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। টক ট্যাঁড়সের বীজ নিঃসৃত তেল লিনোলেয়িক অ্যাসিড (Linoleic Acid) সমৃদ্ধ এবং উদ্ভিজ্জ তেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাছাড়া, টক ট্যাঁড়সের কচি মূল ভোজ্য, তবে বেশ ছিবড়েযুক্ত হওয়ায় অনেকে এড়িয়ে চলেন।

টক ট্যাঁড়সের বীজে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং সেগুলিকে আগুনে সেঁকে নিয়ে গুঁড়ো করে তারপর স্যুপ ও সসে ব্যবহার করা যায়। ভাজা বীজ কফির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের বিভিন্ন ধরণের রোগ এবং শারীরিক জটিলতায় টক ট্যাঁড়সের কিছু ঘরোয়া ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পড়শী দেশ মায়ানমারে দৈহিক দুর্বলতা কমানোর চিকিৎসায় টক ট্যাঁড়সের বীজ ব্যবহার করা হয় এবং পাতা ফোঁড়ায় পুলটিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাইওয়ানে ফুলের বৃতি এবং বীজকে মূত্রবর্ধক এবং রেচক টনিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফিলিপাইন্সে এই গাছের মূল একটি ক্ষুধাবর্ধক তেতো টনিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলায় টক ট্যাঁড়সের শ্লেষ্মাপূর্ণ পাতাগুলি খুশখুশে কাশিতে আরামদায়ক প্রতিকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এটির মৃদু রেচক প্রভাব এবং প্রস্রাব বৃদ্ধি করার ক্ষমতার জন্য জন্য দায়ী অ্যাসকরবিক অ্যাসিড এবং গ্লাইকোলিক

চিত্র 4: টক ট্যাঁড়স গাছের উজ্জ্বল লাল রঙের বৃতিগুলি সবচাইতে আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় অংশ।

অ্যাসিড নামক দু'টি মূল্যবান মূত্রবর্ধক উপাদান। টক ট্যাঁড়সের নির্যাসে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকায় এটি শীতল ঔষধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গরম আবহাওয়ায় আমাদের ত্বকে রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে শীতল করার জন্য লোমকূপগুলিকে প্রসারিত করে স্বস্তি প্রদান করে। টক ট্যাঁড়সের নির্যাস গ্রহণে দেহে অ্যালকোহল শোষণের হার কমে যায়। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, টক ট্যাঁড়সের নিয়মিত সেবন প্রায় 7.5/3.5 ইউনিট (সিস্টোলিক/ডায়াস্টোলিক) রক্তচাপ কমাতে পারে। দেহের পরিপাক এবং রেচন ক্রিয়া ঠিক রাখতে পাতা এবং ফুল থেকে তৈরী চা টনিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শীতকালে পায়ের গোড়ালি ফাটা প্রতিরোধে, ফোঁড়া এবং আলসারের চিকিৎসায় টক ট্যাঁড়সের পাতা গরম করে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া, পাতার নির্যাস থেকে তৈরি লোশন ঘা এবং ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে।

আজ শেষ করি এই কথা বলে যে, টক ট্যাঁড়স একটি স্বল্প পরিচিত কৃষিজ ফসল, যা বহুকাল আগে থেকে বিভিন্ন ভারতীয় রান্নায় ও রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজে এখন পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক মানুষই গাছটির গুরুত্ব এবং বহুবিধ ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। ●

লেখক ***শ্রী দীপাঞ্জন ঘোষ*** *বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক।*
ইমেল: dpanjanghosh@gmail.com

যারা আলো জ্বেলেছিল (পর্ব – ১২)

অরুণাভ দত্ত

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অগ্রগতি সমানুপাতিক। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে ততই বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, সভ্যতার স্বরূপ। শুরুটা হয়েছিল বেঁচে থাকার লড়াই দিয়ে। সে লড়াই আজও থামেনি। চলছে পৃথিবীর অবর্তমানে অন্য গ্রহে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস। গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ থেকে আদিত্য-এল 1, দ্রুততার সঙ্গে মানুষ পৌঁছেছে উন্নতির শিখরে এবং বিজ্ঞানের এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁদের জন্যই যাঁরা অন্ধকার পৃথিবীর বুকে প্রথম বিজ্ঞানের আলো জ্বেলেছিল।

ধনিক শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ।।

এই বিখ্যাত শ্লোকটির রচয়িতা হলেন চাণক্য। কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপদেষ্টা ও মন্ত্রী। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সহায়তায় নন্দ বংশ ধ্বংস করে মৌর্য বংশের তথা মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। হয়ে ওঠেন প্রাচীন ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য সংগঠক। চাণক্য ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। জানা যায়, তাঁর ক্ষুরধার কূটবুদ্ধি ও সময়োপযোগী পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত সুশৃঙ্খল ভাবে দেশ চালাতেন। মানুষের হিতের জন্য চাণক্য যে নীতিগুলি প্রণয়ন করেন, তা আজ বেদবাক্য সমান। শুরুতেই যে শ্লোকটি বলা হল, তার অর্থ হল এই—

'যে স্থানে সৎ রাজা, ব্রাহ্মণ, ধনী, নদী এবং উপযুক্ত চিকিৎসক নেই, সেখানে কখনও বাস করতে নেই।' অর্থাৎ.

(১) সৎ রাজা হন প্রজাদরদী, লোকহিতৈষী।

(২) ব্রাহ্মণ অর্থে শিক্ষক। যিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমে, সুন্দর সমাজ গড়ে তোলেন। সেই সময় শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণদের গৃহে থেকে বিদ্যাভাস করত। জীবনের সেই অধ্যায়টিকে বলা হত ব্রহ্মচর্য। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, পঞ্চতন্ত্রে আমরা সেই ছবি দেখতে পাই।

(৩) ধনীর কাজ দরিদ্রসেবা, জনকল্যাণ।

(৪) নদীতীরে জন্ম হয় সভ্যতার। প্রশস্ত হয়ে ওঠে কৃষি, বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি।

(৫) এবং চিকিৎসকের দায়িত্ব সভ্যতাকে নীরোগ রাখা।

আসল কথাটা হল, এঁরা সকলেই সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয় রাজাকে। ইতিহাসে রাজা ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। তাঁর হাতেই থাকত দেশশাসন ও প্রজাপালনের ক্ষমতা। তাই দেখা যেত, রাজা যদি হতেন অকর্মণ্য, অনাচারী, সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানচর্চার বিরোধী, তা হলে সে দেশ অশিক্ষা, দারিদ্র্যের অন্ধকারে ডুবে যেত, সে দেশের প্রজারা হত কূপমণ্ডুক, দিকে দিকে জ্বলত বিদ্রোহ ও অশান্তির আগুন। আবার যে দেশে বিদ্বানরা সমাদর পেতেন, যে দেশের রাজা হতেন ন্যায়নিষ্ঠ, সঙ্কীর্ণতামুক্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের

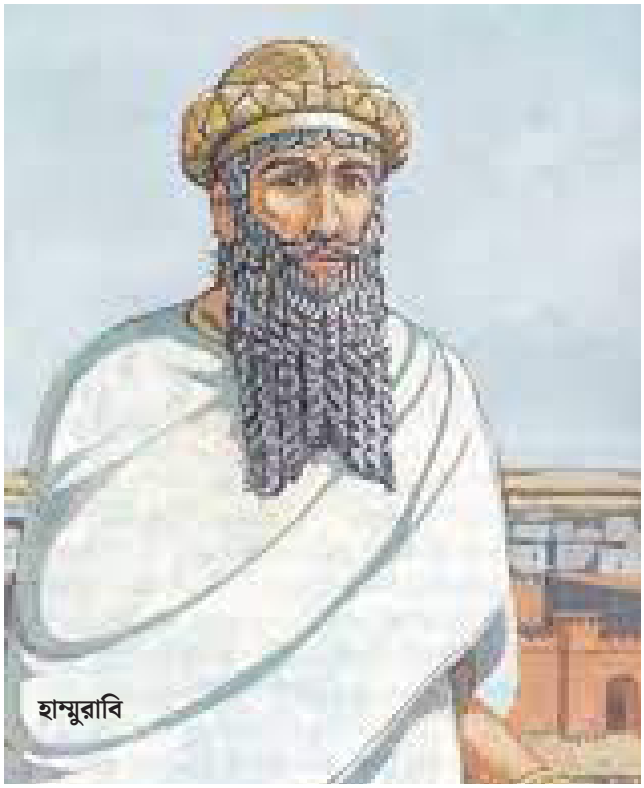
হাম্মুরাবি

পৃষ্ঠপোষক, সে দেশে সোনা ফলত, কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-বাণিজ্যে আসত নবজোয়ার।

বিজ্ঞান হল সভ্যতার বাহন। তাই প্রাচীনকাল থেকেই দেখা গিয়েছে, যে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, সে দেশ ততই উন্নতি করেছে এবং সে দেশের বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন সেখানকার বিদ্যোৎসাহী রাজারা। তাই বলা ভাল, কোনও রাষ্ট্রের শাসনকর্তাই হলেন সেই দেশবৃক্ষের মূল বা গোড়া, আর সেই গোড়া যদি হন জ্ঞানচর্চার বিরোধী, তা হলে আগাগোড়া সবই নষ্ট।

চলুন, জানার সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সেই সমস্ত বিদ্যোৎসাহী রাজাদের কথা জানতে, যাঁরা জ্ঞানের দীপশিখাটি অনির্বাণ রাখার প্রচেষ্টায় কালজয়ী হয়ে গিয়েছেন। গোড়াতেই বলতে হবে রাজা হামুরাবির কথা। হামুরাবি বা হাম্মুরাবি (Hammurabi) ব্যাবিলনিয়ার প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা, এমনকী শ্রেষ্ঠ রাজাও বটে। তাঁর সময়কাল 1750 খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। হামুরাবি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট। ব্যাবিলন শহরকে তিনি ব্যাবিলনিয়ার রাজধানীতে পরিণত করেন। ইউফ্রেতিস নদী পর্যন্ত এলাকা জয় করার জন্য হামুরাবি বার বার যুদ্ধে জড়িয়েছেন। তার পরে যুদ্ধ ত্যাগ করে শান্তির নীতি গ্রহণ করলেন ঠিক মৌর্য সম্রাট অশোকের মতো। পৃথিবীর ইতিহাসে হামুরাবির শাসনকাল একাধিক কারণে

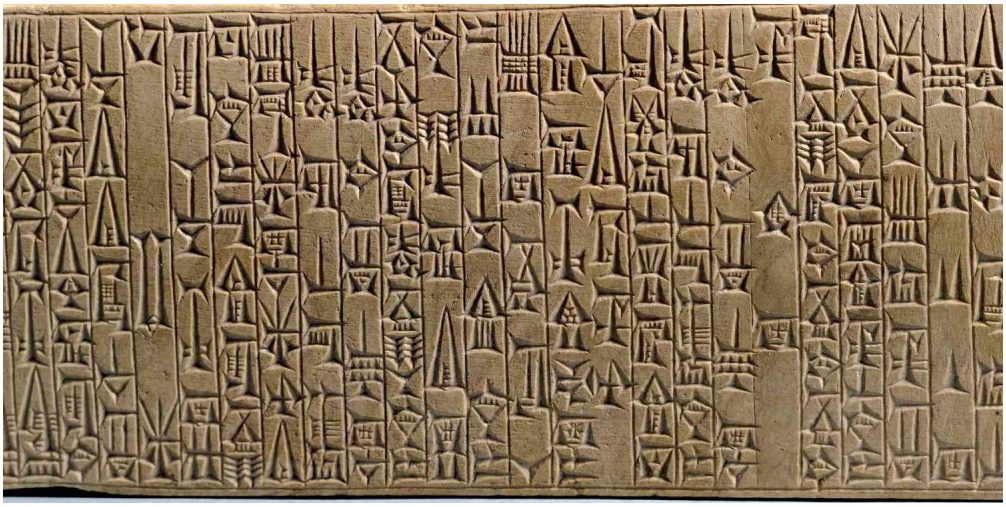

কোড অফ হামুরাবি

গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তা ছাড়াও দেশের উন্নয়ন ও আইনসংস্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনিই প্রথম শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি আইন চালু করেন। সেই আইনগুলি 'কোড অফ হামুরাবি' (code of Hammurabi) নামে সুপরিচিত। এতে আছে প্রায় তিনশোটি আইনসূত্র। 'আইনের চোখে সবাই সমান', এ কথা হামুরাবিই প্রথম ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম 'স্কুল' স্থাপন করেছিলেন।

টলেমি সোতারের আমলে আলেকজান্দ্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল একটি বিরাট মিউজিয়াম, মানমন্দির, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম লাইব্রেরিটি।

বিদ্যোৎসাহী রাজাদের কথা বলতে গেলে উঠে আসবে টলেমি সোতার এবং শার্লমানের (742–814) নাম। এঁদের দুজনের অমর কীর্তির সঙ্গে আমরা এর আগে পরিচিত হয়েছি। সেই যে নীল নদের অববাহিকায় আলেকজান্ডারের প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া শহর। জানা যায়, বন্দরগামী জাহাজকে রাত্রে আলোকসঙ্কেত দেওয়ার জন্য সেই শহরের সম্মুখবর্তী দ্বীপের উপরে নির্মাণ করা হয়েছিল 120 মিটার উঁচু বাতিঘর (light-house)। টলেমি সোতারের আমলে আলেকজান্দ্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল একটি বিরাট মিউজিয়াম, মানমন্দির, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম লাইব্রেরিটি। গ্রিক ও প্রাচ্যের বহু দেশ থেকে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক রচনাবলী সেই লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। ফিওদর করোভকিন পৃথিবীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে প্যাপিরাস ও পের্গামেনোসের (parchment) উপরে লেখা প্রায় 7 লক্ষ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। গবাদি পশুর চামড়া খুব ভালভাবে প্রসেসিং করে লেখার উপযোগী করে নেওয়া হত। তাকেই বলা হত পের্গামেনোস। লাইব্রেরির শান্ত পরিবেশে বিভিন্ন কক্ষে

টলেমি

আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর

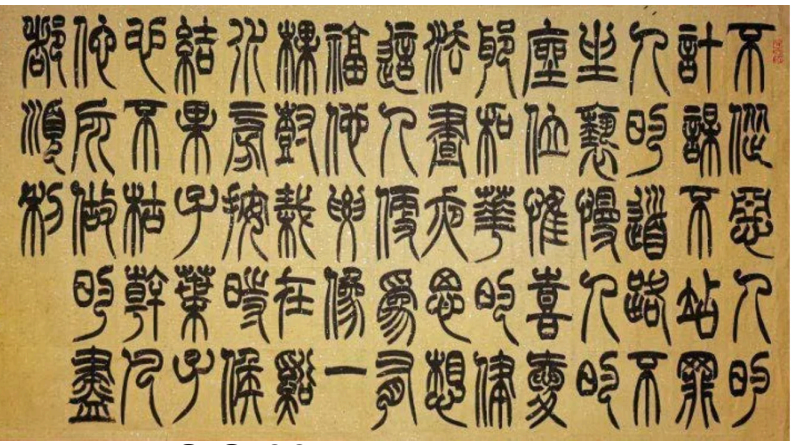

প্রাচীন চীনালিপি

পণ্ডিতরা ওই সমস্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতেন। এই সারস্বতচর্চার কেন্দ্রস্থলেই বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এক সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণে এই লাইব্রেরি ধ্বংস হয়েছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক টলেমি সোতারের অমরকীর্তি আজও পৃথিবীতে 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' হয়ে রয়েছে।

সম্রাট শার্লমানের কথা আমরা জেনেছি ইউরোপের অন্ধকার যুগ পর্যটনের সময়। সম্রাট শার্লমান ছিলেন মধ্যযুগের অন্ধকার ইউরোপের আলোকবর্তিকা। তাঁর হাত ধরে ইউরোপে ক্যারোলিংগিয়ান রেনেসাঁস এসেছিল। বর্বর জাতিগুলিকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে দেশে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং পণ্ডিতদের নিয়োগ করে অচল জ্ঞানচর্চাকে গতি দিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের রাজাদের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রেম অতিমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন চিনের কথাই ধরা যাক। চিনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সভ্যতার প্রথম যুগে চিনে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। সেই পাঁচজন রাজা হলেন— ফুহ্‌সি, সেন্ নুং, হুয়াংতি, ইয়াও এবং শুন। তাঁদের রাজত্বকালে চিন বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। গবেষকদের মতে, রাজা ফুহ্‌সির রাজত্বকাল 2700 খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি। শোনা যায়, রাজা ফুহ্‌সি চীনালিপির প্রচলন করেছিলেন। তাঁরই আমলে প্রথম রেশমকীটের প্রতিপালন শুরু হয় এবং সেই রেশম থেকে বস্ত্রবয়ন পদ্ধতির প্রচলন হয়। রাজা সেন্ নুং-এর আমলে লাঙ্গলের আবিষ্কার হয় এবং কৃষিকাজের প্রচলন হয়। রাজা হুয়াংতির সময় চিনারা চুম্বকের কয়েকটি গুণ আবিষ্কার করে এবং চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার শুরু করে। সেই সময়ে প্রথম বর্ষপঞ্জী লেখা হয়। জানা যায়, রাজা হুয়াংতি স্বয়ং গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ জন্য কিছু পণ্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন। চতুর্থ রাজা ইয়াও ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, কিন্তু তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার উৎসাহে কোনও খামতি ছিল না। রাজা শুন হোয়াংহো নদীর বন্যা রোধের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং চাষের জমিতে জলসেচের জন্য কয়েকটি খাল খনন করিয়েছিলেন।

রাজা হুয়াংতির সময় চিনারা চুম্বকের কয়েকটি গুণ আবিষ্কার করে এবং চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার শুরু করে।

আনুমানিক 1766 থেকে 1122 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শাং বংশ চিনে রাজত্ব করেছিল। সেই রাজাদের আমলেও চিনের বিজ্ঞানচর্চায় ছেদ পড়েনি। তাঁদের পর চিনে শাসনক্ষমতায় ছিল জু (চু) রাজবংশ (1122–256 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। জু রাজাদের আমলে চিনে লৌহযুগ শুরু হয়েছিল। চালু হয়েছিল সুনির্দিষ্ট আইন। ফলে জনসাধারণের উন্নতি ও বিজ্ঞানচর্চা দুই-ই ছিল অব্যাহত। সেই সময় চিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন চিন্তানায়ক কনফুসিয়াস। জানা যায়, চিন প্রাচীনকালে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রচুর উন্নতি করেছিল। সেই সময় চিনে হাড়, রেশমী কাপড়, কচ্ছপের খোলের উপর লেখালেখি করা হত। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চিন আবিষ্কার করল কাগজ।

আবার সুই বংশ (581–618 খ্রিস্টাব্দ) এবং তাং বংশ (618-907)-এর রাজত্বকালে চিন বিজ্ঞানচর্চায় আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। চিনে বিজ্ঞানের শেষ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সং (সুং) রাজবংশের (960–1279 খ্রিস্টাব্দ) নাম উল্লেখ করা যায়। তার পর তাতারদের আক্রমণ এবং চেঙ্গিস খাঁর দাপটে চিন তলিয়ে যায় অন্ধকারে।

এক সময় অন্ধকারে চোখ বুজে পড়েছিল আরবও। তার পর আরব জেগে উঠল হজরত মহম্মদের বাণীতে। সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতোই মহম্মদের বাণী আরবের সমস্ত জড়তাকে কেড়ে নিয়ে নতুন প্রাণসঞ্চার করল। মহম্মদের দেহরক্ষার পরে শিক্ষানুরাগী উমায়দরা সিরিয়া

প্রাচীন চাকাওয়ালা গাড়ি, চীন

হারুন-অল-রশিদ

অল-মামুন

অধিকার করলেন। রাজধানী স্থাপন করলেন দামাস্কাসে। তাঁরা জানতেন যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা মানুষের চক্ষু। তাই তাঁরা দামাস্কাসে গড়ে তুলেছিলেন বিরাট এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমস্ত জ্ঞানী, গুণীদের দামাস্কাসে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, 700 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি দামাস্কাস জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল।

তারপর 740 খ্রিস্টাব্দে আব্বাসিদরা দামাস্কাস দখল করলেন। শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত হল বাগদাদে। মসনদে পালাবদল হল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় দাঁড়ি পড়ল না। বরং তা আরও গতি পেল। দামাস্কাসের চেয়েও বড় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হল বাগদাদে। দামাস্কাসের সমস্ত পণ্ডিতদেরও বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হল। বাগদাদের দ্বিতীয় খলিফা অল-মনসুর (রাজত্বকাল 754–775 খ্রিস্টাব্দ) -এর রাজত্বকালে বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রের জ্ঞানপ্রদীপের দীপ্তি আরও প্রখর হয়ে ওঠে। অল-মনসুরের প্রচেষ্টায় অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য বিদেশ থেকেও অনেক পণ্ডিতদের বাগদাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

এর পর 785 খ্রিস্টাব্দ। বাগদাদের খলিফা হলেন হারুন-অল-রশিদ (রাজত্বকাল 785–809 খ্রিস্টাব্দ)। আরব্য উপন্যাসের দৌলতে তিনি ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন। গবেষকরা তাঁর রাজত্বকালকেই আরবের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। মাত্র চব্বিশ বছরের রাজত্বকালে হারুন-অল-রশিদ বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রজাদরদী, ন্যায়নিষ্ঠ, জ্ঞানপিপাসু সম্রাট হারুন-অল-রশিদ আরবের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করার জন্য প্রথমে প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানগ্রন্থগুলি সংগ্রহ করেন। পরে আরবি ভাষায় সেগুলিকে অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করেন বহু সংখ্যক পণ্ডিত।

দামাস্কাসের চেয়েও বড় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হল বাগদাদে। দামাস্কাসের সমস্ত পণ্ডিতদেরও বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হল।

হারুন-অল-রশিদের পরে খলিফা অল-মামুনও (রাজত্বকাল 813–833) ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা। তাঁর আমলে প্রচুর গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। অল-মামুনের নিয়োজিত অনুবাদক ইবন ইশাক গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী গ্যালেনের গ্রন্থগুলি এবং টলেমির কয়েকটি জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অনুবাদ করেছিলেন ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং হিপ্পোক্রাতেশের লেখা একাধিক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অল-মামুনের আমলেই বিখ্যাত গণিতজ্ঞ মুসা আল-খাওয়ারিজমি ভারতীয় গণিতশাস্ত্রগুলিকে অনুবাদ করেন। শুধু অনুবাদেই থেমে থাকেননি অল-মামুন, জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার জন্য বাগদাদে স্থাপন করেন আকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। অল-ফারখানি নামে এক জ্যোতির্বিদ ওই কেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন। তিনি গণিতজ্ঞও ছিলেন। জানা যায়, তাঁরই উৎসাহে আল-খাওয়ারিজমি 'আল জাবর ওয়াল মুকাবালা' নামক বীজগণিতের বইটি রচনা করেন। এই বইয়ের নাম থেকেই অ্যালজেব্রা (algebra) শব্দটি এসেছে। ●

*লেখক **শ্রী অরুণাভ দত্ত** জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞানকর্মী। ইমেল: wrarunabha18@gmail.com*

সবুজ বাঁশপাতি

তাপস কুমার দত্ত

আমাদের ধারে কাছে যত রকমের পাখি আমার চোখে পড়েছে তাদের মধ্যে যে পাখির কথা না বললেই হবেনা, তা হ'ল গ্রিন বি ইটার (Green Bee Eater) পাখি। 2012 সাল থেকে যখন হালিসহরের রেল হয়ার্ড ও তার আশেপাশে ছবি তুলতে যাই তখনই এই পাখির সাথে আমার প্রথম পরিচয়। সব সময়ে এই পাখি কমবেশী এই অঞ্চলে দেখা মেলে। কপাল যদি ভালো থাকে তবে বাড়ির ধারে কাছেও এদের মিলতে পারে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতে যখনই হালিসহরের রেল ইয়ার্ড মাঠে ছবি তুলতে গিয়েছি তখনই এদের দলবদ্ধ ভাবে একসাথে অনেক গাছের এই পাখির দেখা পেয়েছি।

ইংরাজীতে এই পাখিকে গ্রিন বি ইটার (Green Bee Eater) এবং আমাদের গ্রাম বাংলাতে এই পাখিকে বাঁশপাতি বলে থাকি, কারন এই পাখির গাত্রবর্ন উজ্জ্বল সবুজ বলেই বোধহয় এদের নাম সবুজ বাঁশপাতি, আবার গ্রাম বাংলার অনেকে এই পাখিকে পত্রিঙ্গা, সুইচোরাও বলে থাকে। এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *মিরোপস ওরিয়েন্টালিস* (*Merops orientails*)। এই পাখির গায়ের সবুজ রঙ এবং এর চঞ্চলতা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে। এদের লেজের দিকে সরু সুঁচের মতো একটা লম্বা অংশ থাকে। ঠোঁট কালো রঙের ও সরু হয়ে থাকে। লাল বর্ণের চোখের চারদিকে কালো রঙ থাকে। এদের চোখের মনির রঙ কালো হয়ে থাকে।

এক ডালে কিছুক্ষন বসে আবার অন্য ডালে গিয়ে উড়ে বসে। উড়ার সময়ে মুখে একটা সুন্দর আওয়াজ করে। এরা এক জায়গাতে কখনই স্থির হয়ে বেশীক্ষন বসেনা। তবে বালি আছে এই রকম জায়গা এদের খবই পছন্দের। অনেক সময় মাটির মধ্যে কোথাও বালি থাকলে

সেখানেও এদের বসতে দেখা যায়। এরা পোকামাকড় শিকার করে থাকে এবং তা খাদ্য হিসাবে গ্রহন কর থাকে। তবে এই পাখির সব থেকে প্রিয় খাবার হলো মৌমাছি, তাই এদের হয়তো ইংরাজীতে বি ইটার পাখি বলা হয়ে থাকে, এরা আবার ছোটো ছোটো মৎস্য শিকারও করে থাকে, বিশেষ করে চাষের জমির জমা জলে যেখানে ছোটো ছোটো মাছ থাকে।

এরা লম্বায় প্রায় আট ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে ও এদের দেহের ওজন 20 – 30 গ্রাম হয়ে থাকে। এই সবুজ বাঁশপাতি পাখি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতেই এবং ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই এদের দেখা যায় এবং এরা ছোটো আকারের এক প্রকার শিকারী পাখি। এরা জলের ধারে, বনে জঙ্গলে, ধূলাবালির মধ্যে একসাথে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এরা ট্রিউ ট্রিউ করে মুখে শব্দ করে থাকে। আমরা সকলেই জানি পাখিরা গাছে বাসা বানায় কিন্তু এই পাখি গাছে বাসা বাঁধতে জানেনা। এরা জলা জায়গা, নদীর পাড়ে ও খাঁড়া মাটির ঢালে গর্ত করে বাসা বানায়। মার্চ মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত এদের প্রজনন ক্রিয়া হয়ে থাকে। এদের বাসার গর্তের গভীরে স্ত্রী সবুজ বাঁশপাতি পাখি পাঁচ থেকে সাতটি সাদা রঙের ডিম পাড়ে। এদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে ডিমে তা দিয়ে থাকে, তারপর সেই ডিম ফুটে বাচ্ছা হতে প্রায় একুশ থেকে সাতাশ দিন সময় লেগে যায়।

হালিসহরে রেলহয়ার্ডে আমার নিজের চোখে দেখা এরা বালির মধ্যে বিকাল বেলাতে নিজেদের দেহকে ডুবিয়ে দিয়ে বালি স্নান করতে খুব ভালোবাসে। পাখনার সাহায্যে এরা বালিকে চারদিকে ছড়াতে থাকে এবং এদের দেহকে বালির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বসে থাকে। এই দৃশ্য খুব মজার ও উপভোগ্য। যারা এই দৃশ্য পরখ করেছেন তাদের কাছে এটা খুবই মজার ও উপভোগ্য।

এখনও পর্যন্ত আমাদের পরিবেশে ওদের দেখা মেলে। এখনও এরা রেড লিস্টে পড়েনা। এদের বেঁচে থাকার জন্য যেরকম পরিবেশের দরকার সেই পরিবেশ যদি বজায় থাকে তবে হয়তো এদের নিয়ে আমাদের ভাবনার কোনো ব্যাপার নেই। চারদিকে যেভাবে নগরায়ন হয়ে চলেছে, তার জন্য কতো দিন সেই পরিবেশ বজায় থাকবে সেটাই আমাদের চিন্তার বিষয় হয়ে আজ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। ওরা আমাদের পরিবেশে সব সময়ের জন্য থাকুক এটাই আমরা সবাই চাই। ওদের বেঁচে থাকার পরিবেশ ওদের অনুকূল হয়ে থাকুক এটাই আমাদের কাম্য। ●

*লেখক **শ্রী তাপস কুমার দত্ত** বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tapashkumardutta.2012@gmail.com*

প্রসঙ্গ জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস

অমর কুমার নায়ক

মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ আর আমাদের সীমাহীন চাহিদা পূরণের চাপে পৃথিবীর বৃক্ক আজ বিপন্ন। জলাভূমিকে বলা হয় এই পৃথিবীর বৃক্ক। বৃক্ক, যেমন আমাদের শরীরের দুষিত পদার্থগুলোকে ছেঁকে বাইরে বের করে দেয় আর শরীরকে পরিস্রুত রাখে তেমনি জলাভূমি, নানান দুষিত বর্জ্য পদার্থকে ছেঁকে ফেলে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত হতে সাহায্য করে। আমাদের শরীরের মতই পৃথিবীর দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই বৃক্ক অর্থাৎ জলাভূমি। কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে আসা ধারাবাহিক দূষণ এবং নিধনের ফলে আজ জলাভূমি বিপন্ন। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের নজরে বিষয়টি আসার প্রায় ছাব্বিশ বছর পর ঘুম ভেঙেছে নানান দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের। আর তাই 1971 সালে ক্যাস্পিয়ান সাগরে তীরবর্তী শহর রামসারে আয়োজিত বৈঠক আয়োজিত হয় এবং সেখানে জলাভূমি সংরক্ষণ ও সুসংগত ব্যবহারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দিনটিকে বিশ্ব জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস হিসাবে পালনের। 1997 থেকে বিশ্বব্যাপী ২ ফেব্রুয়ারি দিনটি বিশ্ব জলাভূমি (সংরক্ষণ) দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যেক বছর আলদা 'মূল ভাবনা' ভিত্তিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। 2023 সালের থিম ছিল 'জলাভূমি পুনরুদ্ধার' আর 2024 সালের হল 'জলাভূমি ও মানব সুস্থতা'। এই বছরের থিমের মূল বিষয় হল আমাদের জলাভূমি গুলির সাথে সংলগ্ন মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে এগুলির ব্যবহার করে থাকে তাই জলভূমি যদি না থাকে তাহলে মানুষের সমুহ বিপদ। জলাভূমিগুলি আমাদের পরিস্রুত ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করে। জলাভূমির আশেপাশের অঞ্চলে গড়ে ওঠা বসতির সমস্থ জলের চাহিদা মেটায় সেই নির্দিষ্ট জলাভূমি। এই পৃথিবীর এক শতাংশেরও

অন্ডাল এরোড্রামে বর্ষায় জল জমে অস্থায়ী জলাভূমি তৈরি হয়

অম্বুজা জলাভূমি—বর্তমানে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত

কম মিষ্টি জল ব্যবহারের যোগ্য। আর প্রকৃতি যতটা পরিমাণ জল উৎপন্ন করে তার থেকে অনেক বেশী জলের ব্যবহার আমরা করি। জলাভূমিকে আমারা বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হিসাবেও ব্যবহার করে থাকি। খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন জলজ জীবের প্রতিপালন করার মাধ্যমে। এছাড়াও চাষের প্রয়োজনে ভারতের বেশিরভাগ চাষির জলের যোগান দেয় নিকটবর্তী জলাভূমির জল। কিন্তু নামি বেনামি জলাভূমিগুলির প্রায় সবকটিই আজ বিপন্ন নানান কারণে। বেশ কিছু জলাভূমিকে আমরা নোংরা আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসাবে ঠিক করে ফেলেছি যার ফল হিসাবে সেইসব জলাভূমিতে বাসকরা জীব এবং জলাভূমির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে জড়িত মানুষের সমুহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। অথচ জলাভূমি সম্পর্কে যেসব আইন কানুন আছে তাতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে কোনও ভাবেই জলাভূমিকে বর্জ্য ফেলার জায়গা করা যাবেনা। কারখানার নিষ্কাশন জলাশয়ে মেশার আগে সেটিকে কয়েকধাপ পরিস্রুত করে জলাশয়ে ফেলতে হবে। যেসব জলাশয় মাছ চাষের জন্য বরাদ্দ বা পানীয় জলের উৎস হিসাবে চিন্হিত সেখানে পয়ঃপ্রনালির নিষ্কাশন যুক্ত করা যাবেনা, স্নান করা, কাপড় কাঁচা, পশু চান করানো চলবেনা। কিন্তু কোন নিয়মই সঠিক ভাবে পালিত হয়না। ভূগর্ভস্থ জলের উৎস থেকে মাত্রাতিরিক্ত জল বের করে নেওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র জলকষ্ট দেখা দিচ্ছে। এসব ছাড়াও বিভিন্ন জলাভূমি আজ নজরে এসেছে স্থানীয় প্রমোটার বা দালাল গোষ্ঠীর আর তারা মুনাফার লোভে রাতারাতি জলাভূমি, পুকুর, ডোবা বুজিয়ে তৈরি করছে আবাসন, বাজার বা বিক্রয়যোগ্য বাসভূমি। যদিও এর জন্য যেসব আইনি নিয়ম মানা প্রয়োজন তার কিছুই কার্যকর করা হয়না। আজ জায়গার দাম সবথেকে বেশী আর এই ব্যবসায় লাভের হারও বেশী, তাই অনেকেই নেমে পড়ছে প্রাকৃতিক জলের উৎসগুলি বসতভুমিতে রুপান্তকরনের কাজে।

জলাভূমি রক্ষার জন্য সম্পর্কিত মন্ত্রক অর্থাৎ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয় (MoEFCC) প্রত্যেক

গুঞ্জন ইকোলজিক্যাল পার্ক—একটি প্রাকৃতিক জলাভূমি

ডিএসটিপিএস এর বর্জ্য মিশছে সিঙ্গারনে

বছর বিশ্ব জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস পালনের সাথে সাথে আমাদের দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলি চিন্হিত করে সেগুলি সুরক্ষা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে। বিশেষ ভাবে গুরুত্ব সম্পন্ন জলাভূমিগুলিকে 'রামসার সাইট' হিসাবে ঠিক করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সংস্থার। পশ্চিমবঙ্গের দুটি 'রামসার স্থান' হল পূর্ব কোলকাতা ও সুন্দরবন জলাভূমি। এর মধ্যে সুন্দরবন জলাভূমিটি হল ভারতের বৃহত্তম জলাভূমি। পৃথিবীর ছয় শতাংশ জলাভূমি। ভারতে জলাভূমির সংখ্যা 27403টি। ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়ার সার্ভে অনুযায়ী প্রতি বছর ভারতে 2–3% জলাভূমি হ্রাস পাচ্ছে এবং বর্তমানে 50% জলাভূমি জীবিত। জলাভূমির সাথে আঙ্গিক সম্পর্ক যে শুধু মানুষের তাইই নয় জলাভূমির আশেপাশে বাস করা বিভিন্ন জীবকুলেরও জীবন জড়িত। জলাভূমি কমার সাথে সাথে কমছে কচুরিপানা, বিভিন্ন শ্যাওলা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ প্রাণীরা। এর ফলে ভারী ধাতু সীসা শোধন করার ক্ষমতা কমছে আর তাই পরিবেশ সীসা থেকে দূষণমুক্ত হতে পারছেনা। অতি বৃষ্টির প্রভাবে এখন শহর ভাসছে এবং প্রায়ই বন্যার কবলে পড়তে হচ্ছে কারণ জলাভূমির জল ধারণ ক্ষমতা কমছে। এছাড়া বাড়ছে ভূমিক্ষয়। জলের স্তর কমার কারণে যেমন পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে তেমনি বাড়িয়ে দিচ্ছে আর্সেনিকের প্রভাব। জলজ কীট পতঙ্গের সাথে পতঙ্গভূকরা কমছে ফল হিসাবে বাড়ছে মাছি ও মশাদের অত্যাচার। জলাভূমি নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সমস্যায় পড়ছে জলাভূমিকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা বিভিন্ন প্রাণীরা। জলাভূমি হ্রাস পাওয়ার ফলে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদেরও সমস্যা হয়েছে। বিভিন্ন শীতের পাখি আমাদের এদেশে যারা শীত কাটাতে আসে তাদের অধিকাংশ জলার পাখি। জলাভূমি নষ্ট হওয়ার ফলে তাদের প্রাকৃতিক আবাস কমেছে। এছাড়াও জলাভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরণের গাছের সম্ভারেও ভাঁটা পড়েছে জলাভূমি কমে আসার জন্য। তাই জলাভূমি কেন্দ্রিক বিভিন্ন জীবপরিবেষ্টনকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং সর্বোপরি নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে টিকিয়ে রাখতে হবে জলাভূমি গুলিকে। শুধু প্রসাশনের পক্ষ থেকে বিশেষ দিন পালন করলেই হবেনা, প্রশাসনের পাশাপাশি সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষকে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে বেশ কয়েকটি জায়গার জলাভূমি আজ সুরক্ষিত শুধু সাধারণ মানুষের সতেচনতার জন্য। যেমনটা হয়েছে ইস্ট কোলকাতা ওয়েটল্যান্ডের পুনরুদ্ধারের কাণ্ডারি ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। তাই অবাধে বালিচুরি, জলচুরি সহ পুকুর ডোবা বা জলাভূমি ভরাট করার কাজকে একজোটে বন্ধ করতে রুখে দাঁড়াতে হবে। তবেই সুরক্ষিত থাকবে জল জলাশয় ও জলাভূমি, সেইসঙ্গে আমরাও। ●

রাণীগঞ্জের একটি পরিত্যক্ত খনি—বর্তমানে জলাভূমি

লেখক ***শ্রী অমর কুমার নায়ক*** *একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞানলেখক।*
ইমেল: amarnayak.stat@gmail.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ফেব্রুয়ারি মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

লুনা 9-এর প্রথম চাঁদে অবতরণ

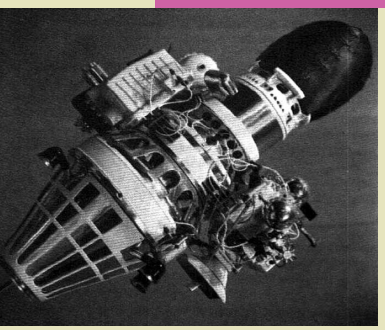

1966 সালের 3রা ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা 9 প্রথম চাঁদে অবতরণ করে। লুনা 9 ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের চাঁদে অবতরণের 12তম প্রচেষ্টা এবং চাঁদে নিয়ন্ত্রিত, রকেটের সহায়তায় অবতরণের প্রথম সাফল্য। লুনা 9 মহাকাশযানটি ছিল গোলাকার দেহ বিশিষ্ট এবং ব্যাস ছিল 58 সেমি। এটিতে একটি রেডিও সিস্টেম, প্রোগ্রামিং ডিভাইস, ব্যাটারি, তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং একটি বিকিরণ সনাক্তকারী ব্যবস্থা সহ একটি হারমেটিকভাবে সিল করা পাত্র ছিল। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5 মিটার দূরে এর ইঞ্জিনগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং ল্যান্ডিং ক্যাপসুলটি খুলে যায়, যা মহাকাশযানের গতি কমিয়ে অবতরণে সহায়তা করে। একটি এয়ারব্যাগ সিস্টেম এবং রকেট ফায়ারিং কুশনও এই কাজে ব্যবহৃত হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে স্পর্শ করার পর এর চারটি পাপড়ির মতো অংশ খুলে গিয়ে এটিকে চাঁদের মাটিতে স্থাপন করে। রড-টাইপ অ্যান্টেনা পাপড়ির অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠগুলিকে প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহার করে পৃথিবীতে তথ্য পাঠানোয় সক্রিয় হয়। ঘূর্ণায়মান মিরর সিস্টেম সহ একটি টেলিভিশন ক্যামেরা চাঁদের পরিবেশের ফটোগ্রাফিক জরিপ শুরু করে। চাঁদের ল্যান্ডস্কেপের প্রথম চিত্রগুলি প্রমাণ করে যে চন্দ্র পৃষ্ঠ একটি ল্যান্ডারের ওজনকে সহ্য করতে পারে। চাঁদে ছয় দিন সক্রিয় থাকার পর ব্যাটারির ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবার ফলে লুনা 9-এর মিশন শেষ হয়।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC)-র জন্য পেটেন্টের আবেদন

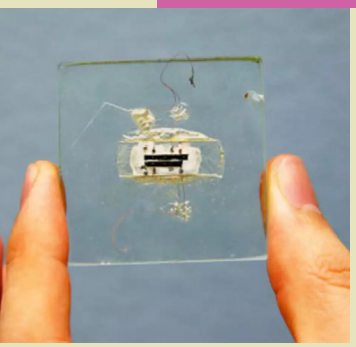

1959 সালের 6ই ফেব্রুয়ারী জ্যাক কিলবি তাঁর আবিষ্কৃত ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC)-র জন্য পেটেন্টের আবেদন করেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির অন্যতম এই আবিষ্কারটি হয়েছিল 1958 সালের 12ই সেপ্টেম্বর। কিলবির আবিষ্কৃত চিপটি হাইব্রিড ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট পর্যায়ভুক্ত। এই আবিষ্কারের জন্য কিলবি 2000 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই যন্ত্রাংশ ব্যবহারের ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের যেমন আকার হ্রাস পেয়ে তার ব্যবহার সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে, তেমনি ঐসব যন্ত্রের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। কিলবি আবিষ্কৃত মাইক্রোচিপটি ছিল একটি পয়সার আকারের। আজকের মাইক্রোচিপগুলি শত শত উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে উন্নত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিলবির প্রোটোটাইপটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ। আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের ভিত স্বরূপ এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির চেহারাকে বদলে দিয়েছে এবং আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করেছে। কিলবির আবিষ্কার মানুষকে মহাকাশ গবেষণা এবং চাঁদে পৌঁছানো, ঘরের আকারের কম্পিউটারকে হাতের তালুর মাপে নিয়ে আসা, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনোদন, চিকিৎসা ক্ষেত্র, এমনকি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতেও সক্ষম করে তুলেছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রই চিপ দ্বারা চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্লুটোর নেপচুনের কক্ষপথকে অতিক্রমন

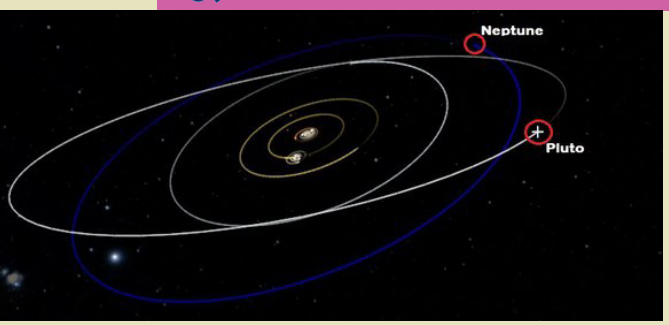

1979 সালের 7ই ফেব্রুয়ারী প্রথম বারের মতো প্লুটো নেপচুনের কক্ষপথকে অতিক্রম করে। প্রতি 248 বছরে এই ঘটনা ঘটার কথা এবং এর ফলে ওই দিন থেকে আগামী 20 বছরের জন্য নেপচুন সৌরমণ্ডলের দূরবর্তিতম গ্রহে পরিণত হয়। সূর্যের চারপাশে তার 248 বছরের ভ্রমণের মধ্যে 20 বছরের জন্য প্লুটো নেপচুনের কক্ষপথের ভিতরে চলে আসে। অবশ্য প্লুটোকে সৌরমণ্ডলের গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পর নেপচুন এখন স্থায়ীভাবেই সৌরমণ্ডলের দূরবর্তিতম গ্রহ। অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে এর ফলে কি এই দুই গ্রহে সংঘর্ষ হতে পারে? সেটা হাওয়া সম্ভব না কারণ এই দুটি গ্রহের কক্ষপথ আলাদা আলাদা ত্রিমাত্রিক তলে অবস্থিত। উপরন্তু আজিমুথাল লিব্রেশন এবং অক্ষাংশ লিব্রেশন নামে পরিচিত প্লুটোর কক্ষপথের দুটি বৈশিষ্ট্যের ফলে তারা কখনই সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না।

প্লুটো আবিষ্কার

পার্সিভাল লোয়েল নামে এক ধনী বোস্টোনিয়ান 1894 সালে অ্যারিজোনায় লোয়েল অবজারভেটরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং 1906 সালে সম্ভাব্য নবম গ্রহের সন্ধানে একটি বিস্তৃত প্রকল্প শুরু করেছিলেন, যাকে তিনি "প্ল্যানেট এক্স" বলে অভিহিত করেন। 1909 সালের মধ্যে লোয়েল এবং উইলিয়াম এইচ. পিকারিং এই ধরনের একটি গ্রহের জন্য বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য মহাকাশীয় স্থানাঙ্কের কথা বলেন। 1916 সালে পার্সিভালের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য এই নবম গ্রহের খোঁজ বন্ধ থাকে যা পুনরায় শুরু হয় 1929 সালে। লোয়েল অবজারভেটরির ডিরেক্টর ভেস্টো মেলভিন স্লিফার 23-বছর-বয়সী ক্লাইড টমবগকে প্ল্যানেট এক্স খুঁজে বের করার কাজ দিয়েছিলেন। স্লিফার তার জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত অঙ্কন দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে মানমন্দিরে কাজে লাগিয়েছিলেন। টমবগ-এর কাজ ছিল নিয়মিতভাবে রাতের আকাশের জোড়া ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করা, তারপর প্রতিটি জোড়া পরীক্ষা করা এবং কোনো আকাশীয় বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা। একটি ব্লিঙ্ক কম্প্যারেটর ব্যবহার করে এই কাজ করা হত। 1930 সালের 18ই ফেব্রুয়ারী প্রায় এক বছর অনুসন্ধানের পর, টমবগ 23 এবং 29 জানুয়ারী তোলা ফটোগ্রাফিক প্লেটে একটি সম্ভাব্য চলমান বস্তু আবিষ্কার করেন। 21 জানুয়ারিতে তোলা অন্য একটি ছবি এই আবিষ্কারকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। পর্যবেক্ষক আরো নিশ্চিত ফটোগ্রাফ প্রাপ্ত করার পর 13ই মার্চ এই আবিষ্কারের খবর হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরিতে টেলিগ্রাফ করা হয়েছিল। নতুন আবিষ্কৃত গ্রহটির নামকরণের জন্য প্রস্তাবিত অনেক নামের মধ্যে মিনার্ভা, প্লুটো ও ক্রোনাস নামগুলি প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়। যদিও প্রথম পছন্দের নাম ছিল মিনার্ভা, কিন্তু একটি ধূমকেতুর নাম মিনার্ভা হবার কারণে নতুন আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম রাখা হয় প্লুটো। ●

ডলির আত্মপ্রকাশ

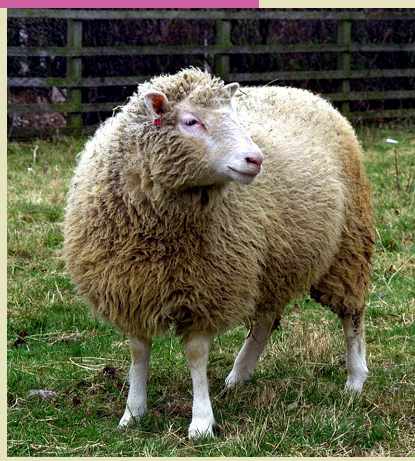

রোজলিন ইনস্টিটিউটের জেনেটিকালি পরিবর্তিত গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য ধারাবাহিক গবেষণার ফসল 'ডলি দ্য শিপ' হল প্রথম ক্লোনিং পদ্ধতিতে উৎপন্ন স্তন্যপায়ী। এই গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা আরও জানতে চেয়েছিলেন যে কীভাবে কোষগুলি বিকাশের সময় পরিবর্তিত হয় এবং একটি বিশেষ কোষ, যেমন একটি ত্বক বা মস্তিষ্কের কোষ সম্পূর্ণ নতুন প্রাণী তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা। ছয় বছর বয়সী ফিন ডরসেট ভেড়ার স্তনগ্রন্থি এবং স্কটিশ ব্ল্যাকফেস ভেড়া থেকে নেওয়া ডিম্বকোষ থেকে ডলিকে ক্লোন করা হয়েছিল। ডলির জন্ম 1996-এর 5ই জুলাই। 1997-এর 22 ফেব্রুয়ারী ডলির সৃষ্টির কথা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করা হয়। এই দিনটি বেছে নেবার কারণ এই ঘোষণাটি ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্র প্রকাশ যাতে একই সঙ্গে হয়। ডলির সৃষ্টি সমস্ত বিশ্বে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ক্লোনিংয়ের সম্ভাব্য সুবিধা এবং বিপদ সম্পর্কে একটি বিতর্কের সূচনা হয়। ডলির এক বছর বয়সের সময় তার জিন পরীক্ষা করে টেলোমেরেজের ত্রুটি ধরা পরে এবং বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন এই প্রাণীটির রোগগ্রস্থ হবার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। ডলির প্রথম সন্তান হয় 1998 সালে। বেশ কয়েকটি সন্তানের জন্ম দানের পর 2000 সাল থেকে ডলি নানা সংক্রমণ ও রোগের শিকার হতে থাকে। 2003 সালের 14 ফেব্রুয়ারী 6 বছর বয়সে ডলির মৃত্যু হয়। বর্তমানে ডলির দেহ এডিনবার্গের স্কটল্যান্ড জাতীয় সংগ্রহালয়ে রাখা আছে। ●

প্লুটোনিয়াম আবিষ্কার

1941 সালের 23 ফেব্রুয়ারী গ্লেন সিবর্গ সহকর্মী আর্থার বহাল ও জোসেফ কেনেডির সহায়তায় বার্কলে রেডিয়েশন গবেষণাগারে দ্বিতীয় ট্রান্স-ইউরেনিয়াম মৌল প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন ও পৃথকীকরণ করেন। এই মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা 94 এবং বিশেষ কিছু পারমাণবিক রিএক্টরের ইন্ধন হিসাবে এই মৌলটির ব্যাপক ব্যবহার আছে। ইউরেনিয়াম-238 কে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে এই মৌলটি উৎপন্ন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মৌলটি ব্যবহার করা হয়েছিল পারমাণবিক বোমা তৈরিতে। প্লুটোনিয়ামের আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন 228.0387 u থেকে 247.074 u পর্যন্ত হতে পারে। তেজস্ক্রিয় বিভাজনের সময় এর থেকে প্রথম আলফা ও পরে বিটা কণার নির্গমন হয়। প্লুটোনিয়াম ও আরো বেশ কয়েকটি ট্রান্স-ইউরেনিয়াম মৌল আবিষ্কারের জন্য গ্লেন সিবর্গ 1951 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। ●

ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

আলেসান্দ্রো ভোল্টা

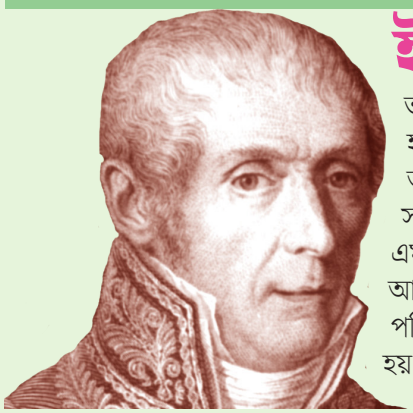

ইতালিয় পদার্থবিদ আলেসান্দ্রো ভোল্টার জন্ম 1745 সালের 18ই ফেব্রুয়ারি, ইতালির কোমো শহরে। তিনি আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন চল-তড়িতের সঙ্গে যে তড়িৎ ছাড়া আমাদের সভ্যতা সম্পূর্ণ অচল। স্থির তড়িতের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আড়াই হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো এবং গ্রীক বিজ্ঞানীরা স্থির তড়িৎ সম্পর্কে জানতেন। আলেসান্দ্রো ভোল্টা কোমো শহরে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন 1770 সাল নাগাদ। এই শহরেই তিনি আর এক অধ্যাপক লুইগি গ্যালভানির সাহায্যে পরিচিত হন এমন একটি পরিঘটনার যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি চল তড়িতের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে আগ্রহী হন। তিনি 1800 সালে প্রথম গড়ে তোলেন এমন একটি ব্যবস্থা যাকে আজকের পরিভাষায় একটি তড়িৎ কোষ বলা যায়। পাওয়া যায় প্রথম প্রবাহী তড়িৎ। বস্তুত সেই শুরু হয় চলতড়িতের জয়যাত্রা। ভোল্টার এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিভব প্রভেদের এস আই এককের তার নামানুসারে হয়েছে ভোল্ট।

লুডউইগ বোল্টজম্যান

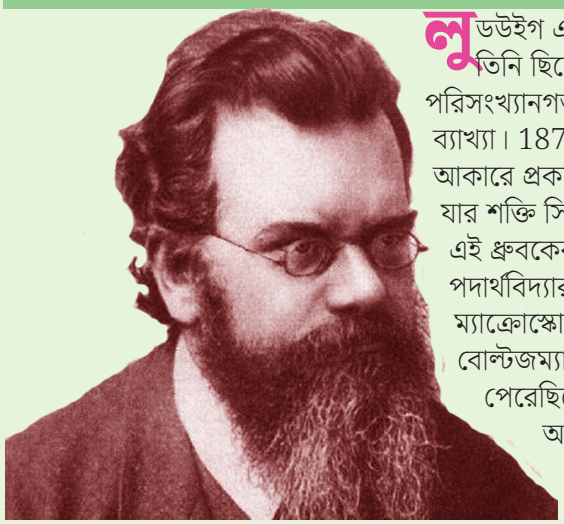

লুডউইগ এডুয়ার্ড বোল্টজম্যান 1844 সালের 20 ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ এবং দার্শনিক। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার বিকাশ এবং তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পরিসংখ্যানগত ব্যাখ্যা। 1877 সালে তিনি এনট্রপির বর্তমান সংজ্ঞা প্রদান করেন যা সমীকরণের আকারে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়, $S = k_B \ln \Omega$, যেখানে Ω হল মাইক্রোস্টেটের সংখ্যা যার শক্তি সিস্টেমের শক্তির সমান এবং k_B একটি ধ্রুবক। পরবর্তী সময় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই ধ্রুবকের নামকরণ করেন বোল্টজম্যান ধ্রুবক। পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা আধুনিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম স্তম্ভ। এটি বর্ণনা করে যে কীভাবে তাপমাত্রা এবং চাপ সংক্রান্ত ম্যাক্রোস্কোপিক পর্যবেক্ষণগুলি আণুবীক্ষণিক পরামিতিগুলির সাথে সম্পর্কিত। বোল্টজম্যানের গ্যাসের গতি তত্ত্বটি পরমাণু এবং অণুর বাস্তবতাকে অনুমান করতে পেরেছিলেন, কিন্তু সেসময় প্রায় সমস্ত জার্মান দার্শনিক বহু বিজ্ঞানী এই তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। বোল্টজম্যান পরমাণুবিদ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের "গ্যাসের গতিশীল তত্ত্বের চিত্র" শিরোনামের গবেষণাপত্র থেকে আণবিক তত্ত্বের বিষয়ে ওয়াকিবহাল হন।

হাইনরিখ হার্টজ

জার্মান পদার্থবিদ হাইনরিখ হার্ৎজ জন্মেছিলেন 1857 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 22 তারিখে। এক অর্থে তার নাম আমাদের সকলের পরিচিত। এস আই পদ্ধতিতে কম্পাঙ্কের একক হার্ৎজ এসেছে তার নাম থেকে। যেমন আমাদের ঘরে যে 220 ভোল্টের এসি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবহৃত হয় তার কম্পাঙ্ক 50 হার্ৎজ। অত্যন্ত মেধাবী এই বিজ্ঞানী তার শিক্ষাগুরু হেরম্যান ভন হেলমহোলৎজের পরামর্শক্রমে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ উপস্থাপনার চেষ্টা করেন। তার এই প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হদিশ পাওয়া যায় তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের যার সম্পর্কে তাত্ত্বিকভাবে ম্যাক্সওয়েল উল্লেখ করেছিলেন। হার্ৎজের এই অবদানের জন্য তার নামটি গ্রহণ করা হয়েছে কম্পাঙ্কের একক হিসেবে। দুঃখের বিষয় 1894 সালে তার সাঁইত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি প্রয়াত হন। সেই সময় তিনি ছিলেন জার্মানির বন শহরের ফিজিক্স ইনসটিটিউটের অধ্যাপক ও নির্দেশক।

সাভান্তে আরহেনিয়াস

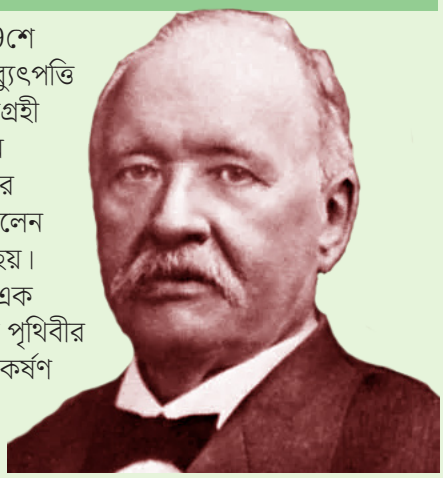

সাভান্তে আরহেনিয়াস বিংশ শতাব্দীর এক খ্যাতনামা রসায়নবিদ। 1859 সালের 19শে ফেব্রুয়ারি সুইডেনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পদার্থবিদ্যায় আরহেনিয়াসের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং প্রথম জীবনে তিনি পদার্থবিদ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি রসায়নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, আর তাই দেখা যায় পরবর্তীকালে আরহেনিয়াস গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান রেখেছেন ভৌত রসায়নে বা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে। 1902 সালে তিনি রাসায়নিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে শারীরবৃত্তীয় সমস্যাগুলির ওপর গবেষণা শুরু করেন। তিনি নির্ধারণ করেছিলেন যে জীবন্ত প্রাণীর শরীরে এবং টেস্টটিউবে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি একই ভাবে সংঘটিত হয়। 1903 সালে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার জয় করেন। তার সময়ে কয়লা ছিল শক্তির এক বৃহৎ উৎস। কয়লা পোড়ানোর ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে যে পৃথিবীর তাপমাত্রা জীবজগতের সহনশীলতার মাত্রা ছাড়াতে পারে, সেই বিষয়ে তিনি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের অধীনস্থ পদার্থবিদ্যার পুরস্কারের জন্য গঠিত নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ●

লাইনাস পাউলিং

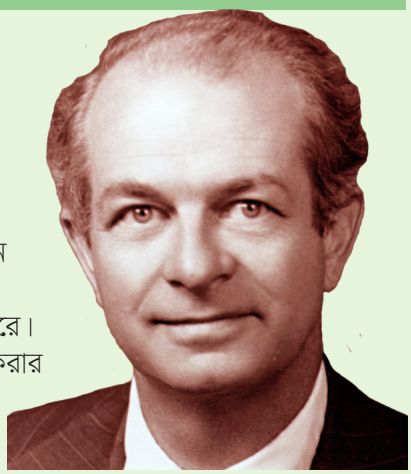

লাইনাস পাউলিং এমন একটি কৃতিত্বের অধিকারী যাকে ঘিরে একটি প্রশ্ন প্রায়শই উঠে আসে কুইজের নানা প্রতিযোগিতায়। 1901 সালের 28শে ফেব্রুয়ারি এই বিখ্যাত রসায়নবিদের জন্ম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। 1954 সালে তিনি নোবেল জয় করেন রসায়নে। আর তারপর 1962 সালে আবারও জয় করেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। এখন পর্যন্ত পাউলিং ছাড়া আরো চারজন (মেরি কুরি, জন বারডিন, ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার ও কার্ল ব্যারি শার্পলেস) দুবার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কিন্তু একমাত্র পাউলিং তার দুবারের নোবেলই পেয়েছেন এককভাবে, কারও সঙ্গে তাকে সেই পুরস্কার ভাগ করে নিতে হয়নি। আর এই বিষয়টিই এখন হয়ে গেছে কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নের উপাদান। পাউলিং তার রসায়নের গবেষণায় খুব বড় অবদান রেখেছেন রাসায়নিক পদার্থের মধ্যাকার পরমাণুগুলির মধ্যেকার বন্ধন বোঝার ব্যাপারে। আর এই বন্ধন বা বন্ডিং এর বোঝার মধ্যে দিয়ে জটিল রাসায়নিক যৌগকে চরিত্র অনুধাবন করার কাজ সহজ হয়ে গেছে। তাই রসায়নে গবেষণা কাজের বিচারে তার অবদান মৌলিক এবং দিকদর্শী। ●

আহমেদ এইচ জিবাইল

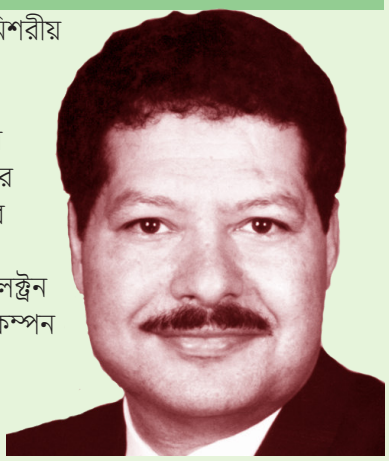

আহমেদ হাসান জিবাইলের জন্ম 1946 সালের 26, ফেব্রুয়ারি। তিনি ছিলেন একজন মিশরীয় এবং আমেরিকান রসায়নবিদ এবং "ফেমটোকেমিস্ট্রির জনক" নামে পরিচিত। তিনি ফেমটোকেমিস্ট্রিতে কাজের জন্য 1999 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নোবেল জয়ী প্রথম মিশরীয় এবং দ্বিতীয় আফ্রিকান। জিবাইলের গবেষণার মূল বিষয় ছিল ফেমটোকেমিস্ট্রি—অর্থাৎ ফেমটোসেকেন্ড সময়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার অধ্যয়ন। এতে আল্ট্রাশর্ট লেজার ফ্ল্যাশ সমন্বিত দ্রুত আল্ট্রাফাস্ট লেজার কৌশল ব্যবহার করে খুব অল্প সময়ের সীমারেখায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ করা হয় যা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রূপান্তর অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্য যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত সময়সীমা। তিনি আল্ট্রাফাস্ট ইলেক্ট্রন ডিফ্র্যাকশনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন, যা আলোর কম্পনের পরিবর্তে ছোট ইলেক্ট্রন কম্পন ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবিদ্যা অধ্যয়নে সহায়তা করে। জেওয়াইল আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সময় প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল অফ অ্যাডভাইজারস অন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (পিসিএএসটি)-এ সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। ●

গ্রন্থ সমালোচনা

গণিতসৌধের নানা গল্প ও গাণিতিক ধাঁধা

বিগত শতকের সত্তর দশকের শুরুতে ধাঁধা নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ বেশ হইচই ফেলে দেয়। অনেক উৎসুক মানুষ এই প্রয়াসে সক্রিয় হলেও যিনি ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি, সেই বিশ্বনাথ বসু আজও পথ হাঁটছেন গণিত সক্রিয়তার নানা বৃত্তে। 2018 সাল থেকে ত্রৈমাসিকভাবে বেরোতে শুরু করে গণিত ভাবনা নামের একটি পত্রিকা। তার প্রধান সম্পাদক আছেন স্বয়ং বিশ্বনাথ বসু, পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ এটির প্রকাশক। এই সংগঠন পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় এযাবৎ কুড়িটি গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। বর্তমান গ্রন্থটি এই ধারার অন্যতম একটি মূল্যবান প্রকাশনা।

কর্মজীবনে শিক্ষকতায় যুক্ত থাকার সূত্রে (প্রধান শিক্ষকের পথ থেকে অবসর গ্রহণ) বিশ্বনাথ বসু পড়াশোনাটা চালিয়ে গেছেন নিরন্তর উৎসাহের তাগিদে। এক দশকের বেশি সময় ধরে জনপ্রিয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' পাতায় কলাম লিখে চলেছেন 'মাথা ঘামাও'। ছোটদের মধ্যে গণিত কৌতূহল প্রসারে প্রায় 60 বছর যাবৎ তাঁর নিরলস নিবেদিত প্রয়াস দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বাংলা ভাষায় বিশিষ্টতম গণিত গদ্য লেখকদের মধ্যে তিনি যে অন্যতম তা বলা বাহুল্য।

বর্তমান গ্রন্থে বারোটি গল্প নিয়ে পরিবেশিত হয়েছে প্রথম ভাগ (51 পৃষ্ঠা ব্যাপী)। প্রতিটি গণিত গল্প যেমন আকর্ষণীয় তেমনি আছে রোমাঞ্চকর ইতিহাসের ছোঁয়া। বিশ্বনাথ বাবুর কলম সংক্ষেপে অনেক বেশি কথা বলায় পারদর্শী। ছোট ছোট গদ্য। কিন্তু পরিবেশন রীতিতে অসম্ভব স্মার্ট। চল্লিশের বেশি গণিতজ্ঞদের কালজয়ী কাজের নানা ছোঁয়া আছে এইসব রচনায়। গণিতচর্চার টাটকা ঝলক পাঠক মনকে আরো নিবিড়ে যেতে উৎসাহিত করবে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আছে—প্রশ্ন নয়, গাণিতিক ধাঁধার ঘোর রোমাঞ্চ। 102 টি ধাঁধা পরিবেশিত হয়েছে 30 পৃষ্ঠা ব্যাপী অধ্যায়ে। প্রত্যেকটি ধাঁধা গণিতের নানা চিন্তা উদ্ভাবনকারী অভিনবত্বের উদাহরণ বিশেষ। চলতি পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রী সমাজ যদি গাণিতিক ধাঁধার সমাধানে আকৃষ্ট হয়, তাতে আখেরে লাভ। গণিত চিন্তা মাথার ভাবনা প্রক্রিয়াকে সহজ ও গতিশীল করে।

তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে—গণিতের আলোকছটায় নানা ঘটনা। গণিত সাম্রাজ্যের পরিধি যে আজও কতটা বহুধা বিস্তৃত, তার নজির মেলে ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনায়।

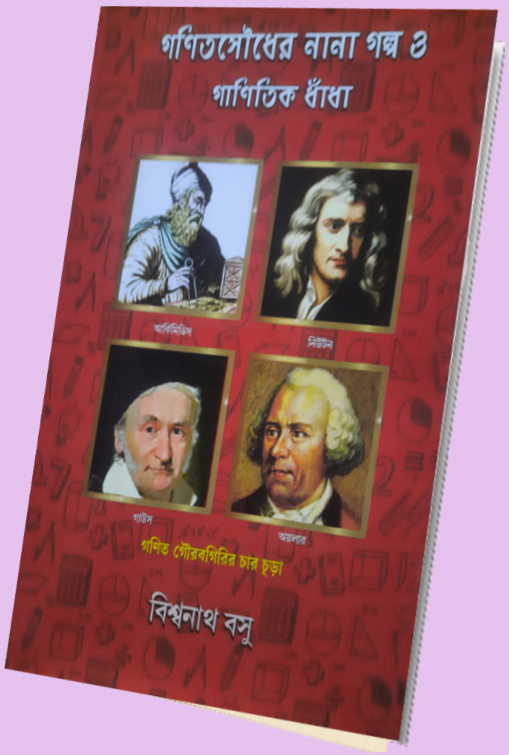

গণিতসৌধের নানা গল্প ও গাণিতিক ধাঁধা
লেখকঃ বিশ্বনাথ বসু
প্রকাশকঃ পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ
পৃষ্ঠা: 112 | মূল্য: 230.00

প্রাচীনকালের গণিত ও আধুনিক গণিত পাশাপাশি থাকলেও পাঠে কোনরকম বিঘ্ন ঘটেনি। এযাবৎ বিশ্বনাথ বাবুর প্রকাশিত গাণিতিক ধাঁধার বই চারটি ও গণিত বিষয়ক বই তিনটি। বর্তমান গ্রন্থটি এই রচনারীতির অংশবিশেষ।

উক্ত বইটির প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ ও কাগজের মান যথেষ্ট ভালো ও আশা রাখি বইটি পাঠক মনে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।

দীপক কুমার দাঁ
পশ্চিমবঙ্গ গণিত পরিষৎ
9064757684

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh@sunpublish.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।